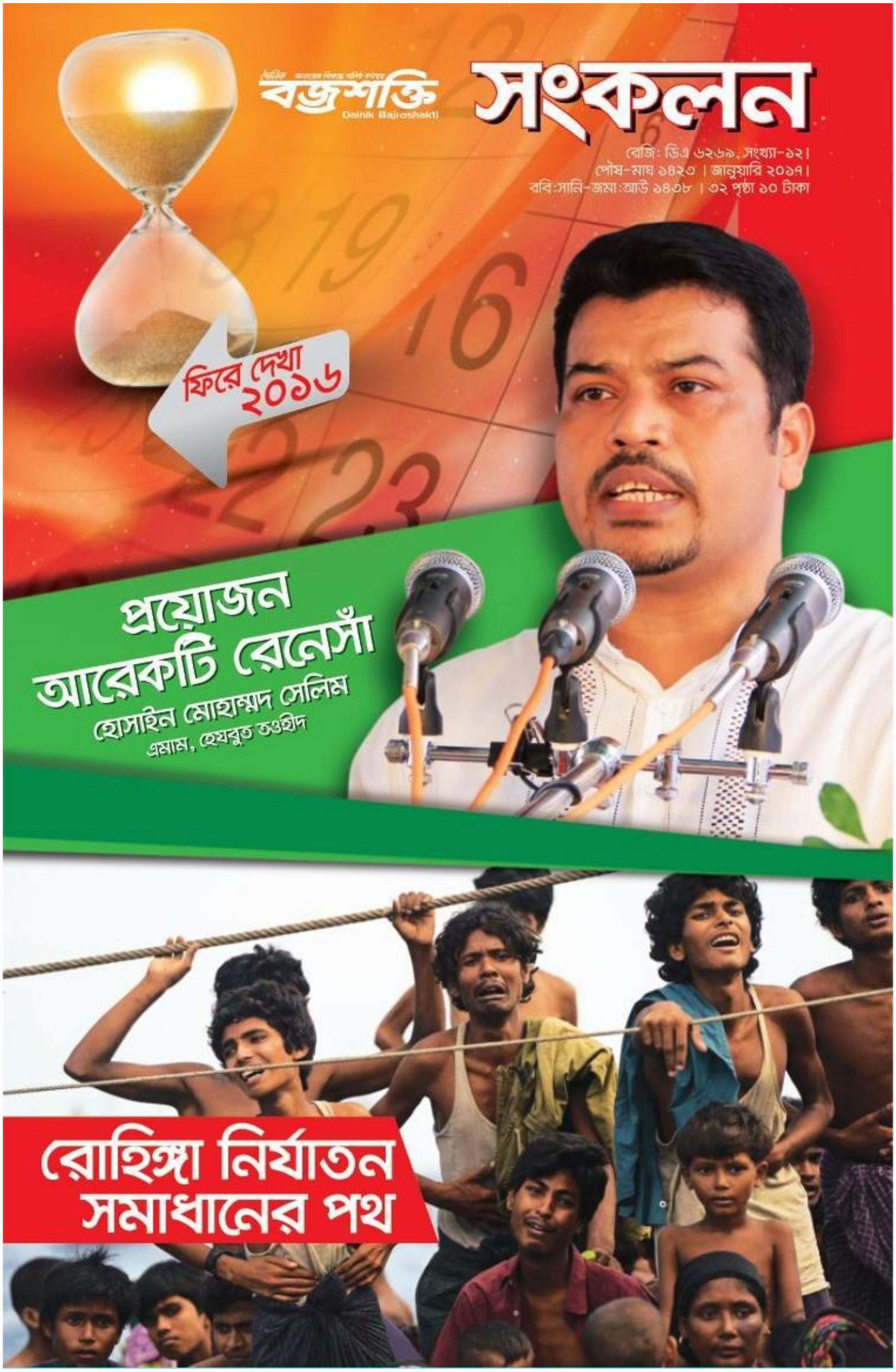
বজ্রশক্তি
Dainik Bajroshakti
সংকলন
রেজি: ডিএ ৬২৬৯, সংখ্যা-১২।
পৌষ-মাঘ ১৪২৩ । জানুয়ারি ২০১৭।
রবি:সানি-জমা:আউ ১৪৩৮ । ৩২ পৃষ্ঠা ১০ টাকা
ফিরে দেখা ২০১৬
প্রয়োজন আরেকটি রেনেসাঁ
হোসাইন মোহাম্মদ সেলিম
এমাম, হেযবুত তওহীদ
রোহিঙ্গা নির্যাতন সমাধানের পথ

সম্পাদকীয়

স্থবিরতা থেকে মুক্তির পথসন্ধান

আরও একটি ঘটনাবহুল বছর অতিক্রম করলাম আমরা। ক্যালেন্ডারে যুক্ত হলো আরও একটি নতুন বছর- ২০১৭। কিছুদিন পূর্বে আমাদের স্বাধীনতার ৪৫ বছর পূর্ণ হলো। নানাদিক দিয়েই নতুন বছরটি আমাদের জন্য যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। ২০১৬ সাল কেবল ঘটনাবহুলই ছিল না, নিঃসন্দেহে এটি ছিল বাংলাদেশের ইতিহাসের অন্যতম একটি দুর্যোগপূর্ণ বছর। সেই দুর্যোগের রাহুগ্রাস ভেদ করে ১৬ কোটি মানুষের সামনে সম্ভাবনার নতুন দুয়ার উন্মোচন করতে আগের বছরটি যেমন মূল্যায়ন করতে হবে, তেমনি মূল্যায়ন করতে হবে স্বাধীনতার পর পেরিয়ে যাওয়া ৪৫টি বছরকেও।

স্বাধীনতার এতগুলো বছর পর এই প্রশ্নটি তোলা অযৌক্তিক হবে না যে আমাদের মুক্তিযুদ্ধ কেন হয়েছিল এবং যে লক্ষ্যে হয়েছিল এই দীর্ঘ সময়ে তার কতটুকু অর্জিত হয়েছে? এই স্বাধীনতা কিন্তু একদিনে অর্জিত হয় নি। ১৯৭১ সন ছিল মূলত দীর্ঘ বঞ্চনা, শোষণ, জুলুম, আমলাতান্ত্রিকতা, ধর্মান্ধতা, ধর্মব্যবসাসহ পাকিস্তান সরকারের হাজারো অযৌক্তিক ও বৈষম্যমূলক কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে বাঙালি জাতির পুঞ্জিভূত ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ। ১৯৪৭ এ যখন দ্বিজাতিতত্ত্বের উপর দেশ ভাগ হলো, কথা ছিল পাকিস্তান হবে মুসলিমদের দেশ আর সেটা ইসলামের মূল্যবোধ দিয়ে পরিচালিত হবে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে মানুষ ইসলাম পায় নি, ইসলামের প্রতিশ্রুত সাম্য, মৈত্রী, ঐক্য, ভ্রাতৃত্ব, ন্যায় বিচার কিছুই পায় নি। বরং পেয়েছে সেই ব্রিটিশ কলোনি সিস্টেম। আগে মানুষ কর দিত ব্রিটিশদেরকে, সাদা চামড়ার মানুষদেরকে, ৪৭ এর পরে কর দেওয়া শুরু করল পশ্চিম পাকিস্তানিদেরকে। আবারও সেই বুর্জোয়া শ্রেণির শাসন আর জুলুমের চিরচেনা দৃশ্য।

তারপরে প্রাকৃতিক নিয়মেই পাকিস্তানি শাসনের পতনের ঘণ্টা বেজে উঠল। মানুষ সৃষ্টিগতভাবে স্বাধীন। তাকে চিরকাল শোষণ করা যায় না, দমিয়ে রাখা যায় না, তাদের মনে ক্ষোভ পুঞ্জিভূত হয় যা একটি সময় আগ্নেয়গিরির মত ঠিকই বিস্ফোরিত হয়। ১৯৭১ সালে সেটাই হয়েছিল। সেই থেকে ৪৫ বছর চলে গেল। ব্রিটিশ শাসনামলে আমাদের অর্থ পাচার হয়ে যেত ব্রিটেনে, এরপর আমরা দেখলাম আমাদের কষ্টার্জিত সম্পদ পাচার হয়ে যাচ্ছে পাকিস্তানে। কিন্তু গত ৪৫ বছরে আমাদের হাজার হাজার কোটি ডলার পাচার হয়েছে কোথায়? আজও সেই একই ধারাবাহিকতা। আর দেশের অভ্যন্তরে সেই ধর্মান্ধতা, ধর্মের নামে সংঘাত, সেই একইভাবে জাতিকে পেছনের দিকে নিয়ে যাওয়ার সকল প্রক্রিয়া চলছে। কাজেই ৭১-এর যে মূল চেতনা ছিল তা মুখ থুবড়ে পড়েছে বহু আগেই। পাকিস্তান আমলে পূর্ব পাকিস্তানের অত্যাচারী শাসকের দাপটে দুর্বল জনতা থর থর করে কাঁপতো, আর এখন তাদের জায়গায় নব্য হানাদাররা শুরু করেছে সন্ত্রাস, দুর্নীতি, অর্থ পাচার, জালিয়াতি, রাজনীতির নামে লুট। আর অধিকাংশ জনতা অন্যায়ের কাছে আত্মসমর্পণ করেছে। সেই স্থবিরতা, সেই কূপমণ্ডূকতা, সেই লুটতরাজ, সেই জুলুম, সেই অন্যায় বহু বহুগুণ

সূচিপত্র

- নতুন বছরের অঙ্গীকার– ঐক্যবদ্ধ সমৃদ্ধ দেশ গড়ব এবার । ৩
- ফিরে দেখা ২০১৬ । ৯
- রোহিঙ্গা নির্যাতন ও মুসলিম জাতির করণীয় । ১৬
- মহানবী (স.) এর আবির্ভাব: প্রকৃত ইসলাম কী পরিবর্তন এনেছিল আরবদের? । ২৩
- মুসলিম জাতির সঙ্কট ও পরিত্রাণের পথ । ২৪
- আকিদা-ঈমান-আমল । ২৬
- প্রয়োজন আরেক রেনেসাঁ । ২৮
- মো'মেনের বৈশিষ্ট্য । ৩১
- বাংলার ইতিহাসের সাথে এমামুয্যামানের যোগসূত্র । ৩২

প্রকাশক ও সম্পাদক: এস এম সামসুল হুদা ১৩৯/১, তেজকুনী পাড়া, তেজগাঁও, ঢাকা-১২১৫ কর্তৃক মানিকগঞ্জ প্রেস, ৪৪ আরামবাগ, মতিঝিল, ঢাকা থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত। **উপদেষ্টামণ্ডলী:** মসীহ উর রহমান, উম্মুত তিজান মাখদুমা পন্নী, রুফায়দাহ পন্নী, **বার্তা ও বাণিজ্যিক কার্যালয়:** ২২৩, মধ্য বাসাবো, সবুজবাগ, ঢাকা- ১২১৪, ০২-৭২১৮১১১, ০২-৮১১৯০৭৬, ০১৭৭৮-২৭৬৭৯৪, **বিজ্ঞাপন বিভাগ:** ০১৮১৬৭১২১৫৮ ওয়েব: www.bajroshakti.com ই-মেইল: bajroshakti@gmail.com

বৃদ্ধি পেয়েছে। একজন বৃদ্ধ লোককে জিজ্ঞেস করলেই জানা যাবে যিনি ব্রিটিশ যুগ দেখেছেন পাকিস্তান যুগ দেখেছেন আবার স্বাধীন বাংলাদেশও দেখেছেন, তিন কালের মধ্যে পরিসংখ্যান করলে যে চুরি-ডাকাতি, খুন, রাহাজানী বেড়েছে না কমেছে? নিশ্চয়ই তিনি বলবেন বেড়েছে। তাহলে আমাদের অর্জন কোথায় গেল? হ্যাঁ, বস্তুগত উন্নয়ন হয়েছে। ব্রিজ কালভার্ট, দালানকোঠা হয়েছে। কিন্তু আমাদের আত্মা পচে গেছে, মানবতাবোধ হারিয়ে গেছে, দুই বছরের শিশু ধর্ষিত হচ্ছে। আর আমাদের আত্মা পর্যন্ত পাশ্চাত্যের ঋণের জালে বন্দী হয়ে পড়েছে। এককেন্দ্রিক বিশ্বব্যবস্থা যেভাবে চলছে তাতে সাম্রাজ্যবাদী দানবদের হাত থেকে বাংলাদেশকে রক্ষা করাই হবে আগামী দিনের সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ।

এতো গেল দেশের অবস্থা। পার্শ্ববর্তী দেশ মিয়ানমারে রোহিঙ্গাদের উপর যে নৃশংসতা চলছে আমরা তার বিরুদ্ধে মৌখিক প্রতিবাদ ছাড়া কিছুই করতে পারছি না, কারণ এই আধুনিক বিশ্বব্যবস্থায় সাধারণ মানুষের কিছু করার থাকে না। কেউ কেউ উদ্বাস্তু শিবিরে গিয়ে শীতবস্ত্র, খাদ্য সামগ্রী বিতরণের উদ্যোগ নিয়েছেন। কিন্তু মূল সমস্যা তাতে দূর হবে না। তাদের দরকার হচ্ছে পায়ের নিচের মাটি, তাদের পূর্ব পুরুষের বাসস্থান, প্রয়োজন একটি আত্মপরিচয়, আত্মমর্যাদা ফিরিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করা। বিশ্ব-সম্প্রদায়ের সবাই মিলে মিয়ানমারের উপর চাপ সৃষ্টি করে সেটার ব্যবস্থা করতে না পারলে উদ্বাস্তুরা ক্রমেই মাদকব্যবসা, দেহব্যবসা, জঙ্গিবাদসহ বিভিন্ন অন্ধকার পথে পা বাড়াতে বাধ্য হবে। এই চাপ প্রয়োগ করা অবশ্যই ন্যায়সঙ্গত, কারণ যেখানেই মানবতা বিপন্ন সেখানেই মানবিক সাহায্যের জন্য যে কোনো পদক্ষেপ নিতে জাতিসংঘসহ অন্যান্য জাতিরাষ্ট্রগুলো অঙ্গীকারাবদ্ধ। রোহিঙ্গারা যদি মুসলমান না হয়ে খ্রিষ্টান জনগোষ্ঠী হতো তাহলে হয়তো আমরা তাদের বিষয়ে বিশ্ব-সম্প্রদায়ের ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি দেখতে পেতাম। ছিন্নমূল জনগোষ্ঠীকে স্বার্থান্বেষীরা বহুভাবে ব্যবহার করে থাকে। যে অবর্ণনীয় দুঃসহ মর্মান্তিক ঘটনাবলীর মধ্যে দিয়ে তাদের জীবন যাচ্ছে তাতে ঐ সমাজের প্রতি তাদের ক্ষুব্ধ হওয়ার যথেষ্ট কারণ থাকবে। তাদের সেই ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ যে কোনো নৃশংস ঘটনার মাধ্যমে তারা ঘটাতে পারে, এটা মনস্তত্ত্ববিদদের, সমাজবিজ্ঞানীদের, রাষ্ট্রনায়কদের অবশ্যই বিবেচনা করতে হবে। এখন চাল ডাল শীতের কাপড় যারা দিচ্ছেন তারা মহৎ কাজ করছেন সন্দেহ নেই, কিন্তু এতে করে নৃশংসতা বন্ধ হবে না, মানবতা প্রতিষ্ঠা হবে না। কারণ চলমান বিশ্বব্যবস্থাটাই মানবতাহীন, বস্তুবাদী, স্বার্থবাদী, নির্মম। তারা মানবতা শব্দটিকেও ছল, চাতুরি ও প্রতারণার কাজে ব্যবহার করছে।

এখন মানবজাতিকে যদি রক্ষা পেতে হয় তাহলে দরকার আরেকটা রেনেসাঁ ঘটানোর। ইউরোপে রেনেসাঁ হয়েছিল প্রাচীন চিন্তার স্থবিরতা, জড়ত্ব, ধর্মের নামে অধর্ম, রাজা ও সামন্ত প্রভুদের যাঁতাকলের নিষ্পেষণের বিরুদ্ধে। মানুষের অপার চিন্তাশক্তিকে জাগিয়ে তুলেছিল সেই রেনেসাঁ। ইউরোপের মানুষ যখন বিকৃত ধর্মের চোখ রাঙানি ও অত্যাচারীর চাবুককে উপেক্ষা করে চিন্তা করতে উদ্বুদ্ধ হলো তারা জ্ঞান বিজ্ঞানের প্রতিটি ক্ষেত্রে নব নব আবিষ্কার করতে সক্ষম হলো, তারা শিল্পকলায় বিস্তর উন্নতি করল, বহু রাজনৈতিক মতবাদ আবিষ্কার করল। তাদের উদ্দেশ্য ছিল একটি উদার শান্তিময় স্বর্গীয় পৃথিবী। কিন্তু রেনেসাঁর ধারকরা দুনিয়াটাকে নিজেদের উপনিবেশ বানিয়ে শোষণ করতে শুরু করল।

তাদের কাজের ফলে জন্ম নিল একটি আত্মাহীন, মানবতাবর্জিত, বস্তুতান্ত্রিক, ভোগবাদী সভ্যতা, যার একমাত্র লক্ষ্য হলো যান্ত্রিক প্রগতি ও বৈষয়িক উন্নতি। এটা আসলে প্রকৃত সভ্যতাই নয়। গত শতকে পরপর দু'টি বিশ্বযুদ্ধ হওয়ার মাধ্যমেই প্রমাণ হয়ে গেল যে এই সভ্যতা মানুষকে অনেক উন্নত যন্ত্র উপহার দিতে পারলেও শান্তি ও মানবাধিকার দিতে পারে নি এবং পারবেও না। তখন থেকে চলছে শুধু পারমাণবিক শক্তির শাসন, তার সামনে সবাই স্রেফ বোবা, কালা অন্ধ। সেখানে চলছে দুর্বলের উপর সবলের অত্যাচার, সরলের উপর ধূর্তের বঞ্চনা, দরিদ্রের উপর ধনীর শোষণ, শাসিতের উপর শাসকের জুলুম। নরকযন্ত্রণা কি এর থেকেও কঠিন?

তবুও আমরা যুগের পর যুগ সেই অন্তঃসারশূন্য পশ্চিমা সভ্যতাকেই অন্ধের মতো অনুকরণ, অনুসরণ করে যাচ্ছি, শান্তির জন্য বিকল্প চিন্তা করতে পারছি না। আমাদের মস্তিষ্কগুলো আবারও সেই ইউরোপের রেনেসাঁপূর্ব সময়ের মত জড়ত্ব আর স্থবিরতায় আচ্ছন্ন হয়ে আছে। কথিত সভ্যতার আধুনিক বিশ্বব্যবস্থার বেড়াজালে প্রতিনিয়ত মানবাধিকার লঙ্ঘিত হচ্ছে। কিন্তু মানুষ অসহায়, তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছে - তাদের কিছুই করার নেই। অর্থাৎ মানবজাতি অন্যায়ের কাছে আত্মসমর্পণ করেছে। সে সম্পূর্ণ আত্মকেন্দ্রিক ও স্বার্থপর জীবনযাপন করছে। এখানেই মানুষ হিসাবে মানুষের মৃত্যু ঘটেছে।

এ অবস্থায় অনিবার্য হয়ে পড়েছে আরেকটি রেনেসাঁ, যা মানুষের চিন্তার স্থবিরতা, দৃষ্টির অন্ধত্ব দূর করবে আর হৃদয়ের উপলব্ধি ক্ষমতা জাগ্রত করবে, অবশ হওয়া হাত দুটোকে মুষ্ঠিবদ্ধ করে প্রতিবাদে আসমানের দিকে উত্থিত করবে। মানুষের সেই জাগরণই পারবে আসন্ন ভয়াবহ ধ্বংস থেকে পৃথিবীকে, মানবজাতিকে রক্ষা করতে। প্রযুক্তির জাগরণ কম হয় নি, এবারের জাগরণ হবে মানবিকতার। প্রযুক্তির সাথে মানবতা যোগ হলেই মানুষ প্রকৃতপক্ষে সভ্য হবে, উন্নত হবে।

এবারের এ সংকলনটি এ বিষয়গুলোকে সামনে রেখেই প্রস্তুত করা হয়েছে। এটি পড়ে যদি প্রিয় পাঠকবৃন্দ উপকৃত হন, সচেতন হন তাহলে আমাদের এই নিঃস্বার্থ প্রচেষ্টা সার্থক হবে।

নতুন বছরের অঙ্গীকার

ঐক্যবদ্ধ সমৃদ্ধ দেশ গড়ব এবার

রাকীব আল হাসান

স্বাধীন একটি জাতি হিসাবে আমরা আরও একটি বছর শুরু করলাম। পেছনে ফেলে আসলাম ৪৫ টা বছর। ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর আমরা বিজয় অর্জন করি, পূর্ণরূপে স্বাধীনতা পাই। দীর্ঘদিনের পরাধীনতার শৃঙ্খল ছিন্ন করে একটি স্বাধীন জাতি হিসাবে বিশ্বের বুকে মাথা উঁচু করে দাঁড়ানোর সম্ভাবনার দুয়ার উন্মোচিত হয়েছিল সেদিন। আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের এই যুগে, গতি-প্রগতির এই যুগে একটা জাতির জন্য ৪৫ বছর কম সময় নয়, একটা বিরাট সময়। নতুন আরেকটি বছর শুরু করার পূর্বে আমাদেরকে একবার পেছন ফিরে দেখতে হবে এই দীর্ঘ সময়ে আমরা কতটুকু সামনের দিকে অগ্রসর হতে পেরেছি, নিজেদেরকে কতটুকু উন্নত করতে পেরেছি, স্বাধীনতার লক্ষ্য কতটুকু বাস্তাবায়ন করতে পেরেছি, আমরা কোথায় ছিলাম, এই সময়ে আমাদের কতদূর যাওয়া সম্ভব ছিল ইত্যাদি। আমাদের জানতে হবে আমরা কোথায়, কবে স্বাধীনতা হারিয়েছিলাম, পুনঃরায় স্বাধীনতা অর্জনের জন্য এই জাতি কত ত্যাগ স্বীকার করেছে, কত সংগ্রাম করেছে। যারা এ দেশের স্বাধীনতার জন্য নিজেদের সর্বস্ব কোরবান করে গেছেন তাদের প্রতি কেবল শ্রদ্ধা প্রদর্শনই যথেষ্ট নয়, তারা যে উদ্দেশ্যে আত্মত্যাগ করে গেছেন সেই উদ্দেশ্য কতটুকু বাস্তবায়ন হলো তার মূল্যায়ন করার সময় এসেছে আজ।

যেখানে আমরা স্বাধীনতা হারিয়েছি:

সুলতানি আমল পর্যন্ত এই বঙ্গভূমি স্বাধীন ছিল। টাঙ্গাইলের করটিয়ার ঐতিহ্যবাহী পন্নী (পূর্বে এই বংশের নাম ছিল কাররানি) পরিবারের উত্তরসূরি সুলতান দাউদ খান কাররানি ছিলেন বাংলার সর্বশেষ স্বাধীন সুলতান। ১৫৭৬ খ্রিষ্টাব্দে রাজমহলের যুদ্ধে এই বঙ্গভূমির স্বাধীনতা রক্ষার জন্য তিনি জীবন দেন। সুলতান দাউন খান কাররানির আমলে স্বাধীন সুলতান হিসাবে তার নামেই খুতবা পাঠ করা হতো এবং তার নামেই মুদ্রা প্রচলিত ছিল।

পিতা সুলতান সুলেমান খান কাররানি ও জৈষ্ঠ ভ্রাতা সুলতান বায়াজীদ খান কাররানির মৃত্যুর পর ১৫৭২

সালে সুলতান দাউদ খান কাররানি ক্ষমতায় আসীন হন। তিনি শুধু বাংলার সালতানাত নিয়ে সন্তুষ্ট ছিলেন না, তিনি শের শাহ শুরির মতো উচ্চাভিলাষী ছিলেন এবং সমগ্র ভারত উপমহাদেশ এই বাংলার অধীন করার স্বপ্ন দেখতেন। তিনি সুলতান হয়েই বাংলার সমস্ত অঞ্চল বশীভূত করে নিজের নামে খোতবা ও মুদ্রা প্রচলন করেন। তার লোক লস্কর ও সৈন্য সংখ্যা ছিল প্রচুর। ৪০,০০০ সুসজ্জিত অশ্বারোহী সৈন্য, ৩৩০০ হস্তী, ১,৪০,০০০ পদাতিক সৈন্য এবং এর মধ্যে বন্দুকধারী, গোলন্দাজ, তীরন্দাজ প্রভৃতি সকল শ্রেণির সৈন্যই ছিল। ২০,০০০ আগ্নেয়াস্ত্র- এর অধিকাংশই ছিল প্রাচীর ধ্বংসকারী কামান, বহু সশস্ত্র নৌযান ও যুদ্ধের অন্যান্য সরঞ্জামও মওজুদ ছিল। এমতাবস্থায় তিনি মুঘল সম্রাট আকবরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে সীমান্তে গোলযোগ সৃষ্টি করেন। মুঘল সাম্রাজ্যের সাথে বেশ কিছু যুদ্ধ হয় তার, তিনি কিছু যুদ্ধে জয়ী হন এবং কিছু যুদ্ধে পরাজিতও হন। সর্বশেষ ১৫৭৬ সালের ১২ জুলাই রাজমহলের যুদ্ধে তিনি পরাজিত ও বন্দী হন এবং তাকে হত্যা করা হয়। তিনি এই বঙ্গভূমির স্বাধীনতা রক্ষার জন্য জীবন দিয়ে যান। প্রকৃতপক্ষে তাঁর পরাজয়ের মাধ্য দিয়েই বাংলার স্বাধীনতার সূর্য অস্তমিত হয়। ঐতিহাসিক বিচারে এই দাউদ খান পন্নীই বাংলার ইতিহাসে সর্বশেষ স্বাধীন শাসনকর্তা ছিলেন। পন্নী রাজবংশের পরাজয়ের পর বারো ভূঁইয়াখ্যাত পন্নীদের অনুগত দৃঢ়চেতা কমান্ডার ও জমিদারগণ দিল্লির কেন্দ্রীয় সরকারকে অস্বীকার করে আঞ্চলিকভাবে স্বাধীনতা ঘোষণা করলেও পরে অবশ্য তারাও মোঘলদের বশ্যতা স্বীকার করতে বাধ্য হন। অর্থাৎ পরবর্তী সময়ে এই বঙ্গভূমি পরিচালনা করেছে মোঘল সম্রাটদের অধীনস্ত ও মোঘল সম্রাট কর্তৃক নিয়োগকৃত নবাবগণ (নায়েব)।

উল্লেখ্য, সুলতান দাউদ খান কররানী যুদ্ধে পরাজিত হয়ে খানজাহানের হাতে নিহত হওয়াকে দিল্লির সম্রাট ভালো চোখে দেখেন নি। তিনি এই বীরের প্রতি যথোচিত সম্মানজনক ব্যবহার না করায় অসন্তোষ প্রকাশ করেন। পরে তিনি এর জন্য দায় স্বীকার করে অনুতপ্ত হন এবং পন্নী বংশের পরবর্তী সদস্যদের সাথে সুসম্পর্ক গড়ে তোলেন। বাদশাহের আনুকূল্যে পরবর্তী পন্নীগণ বাংলাসহ অনেক এলাকায় শাসনকার্য পরিচালনা করেন। মুঘল আমল ও ব্রিটিশ আমলেও এই পন্নী পরিবারের সদস্যগণ অত্যন্ত সততার সাথে, ন্যায়পূর্ণভাবে জমিদারি করেছেন এবং সাধারণ মানুষের ভালোবাসা ও শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন। এই পরিবারেরই সদস্য হেযবুত তওহীদের প্রতিষ্ঠাতা এমাম, এমামুয্যামান জনাব মোহাম্মদ বায়াজীদ খান্ন পন্নী।

ব্রিটিশদের অধীন হওয়ার কথা:
দাউদ খান কাররানির মৃত্যুর পর থেকে এই অঞ্চল শাসন করে আসছিল মোঘলদের নিযুক্ত সুবেদার ও নবাবগণ। মুসলিম নবাবগণ প্রজা বাৎসল্য ও ন্যায়বিচারের জন্য সাধারণ প্রজাদের মধ্যে বেশ জনপ্রিয়তা পান। কিন্তু খ্রিষ্টীয় আঠারো শতকের প্রথম দিকে এই উপমহাদেশের দুর্বল মোঘল সম্রাট এবং বাংলার শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত মোঘলদের নিযুক্ত সুবেদারগণ অর্থাৎ নবাবদের দেশ পরিচালনার ব্যর্থতা, সীমাহীন দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি, ভোগবিলাস এবং চারিত্রিক দৃঢ়তার অভাবে উপমহাদেশে বাণিজ্য করতে আসা ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি সামরিকভাবে নিজেদের অবস্থান সুসংহত করতে শুরু করে। নবাব আলীবর্দী খানের মৃত্যুর পর তার প্রিয় দৌহিত্র সিরাজ-উদ-দৌলা চরম প্রতিকূলতার মধ্যে বাংলা, বিহার, উড়িষ্যার নবাব হিসেবে মসনদে অধিষ্ঠিত হন। সিরাজ-উদ-দৌলা সিংহাসনে বসার পর থেকে ষড়যন্ত্রকারীরা তৎপর হয়ে ওঠে তাকে সিংহাসনচ্যুত করার জন্য। ষড়যন্ত্রকারীদের মধ্যে ছিলেন ঘষেটি বেগম, রাজা রাজবল্লভ, রায়দুর্লভ, জগৎশেঠ, রাজা কৃষ্ণবল্লভ, মানিক চাঁদ, আমির চাঁদ, আমির বেগ, খাদেম হোসেন, ইয়ার লতিফ খান, ওয়াটস, নবকুমার এবং প্রধান সেনাপতি মীরজাফর। তাদের বিশ্বাসঘাতকতার ফলে ১৭৫৭ সালের ২৩ জুন পলাশির যুদ্ধে লর্ড ক্লাইভের ক্ষুদ্র সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে নবাব সিরাজ উদ দৌলার দল পরাজিত হয়। এরপর থেকে ধীরে ধীরে বাংলা, বিহার, উড়িষ্যার নিয়ন্ত্রণ চলে যায় ইংরেজদের হাতে।

স্বাধীনতার প্রথম প্রয়াস
ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন:
এর পরের ইতিহাস ইংরেজ শাসকদের অত্যাচার, অনাচার, নির্যাতন আর বঞ্চনার নির্মম ইতিহাস। কিন্তু বাঙালি জনগণ কখনোই ওই ঔপনিবেশিক শাসন ও শোষণকে মেনে নেয়নি। নানাবিধ কারণে বাংলার মুসলমানেরা গোড়া থেকেই ইংরেজ শাসনের বিরোধী হয়ে উঠেছিল। পলাশির যুদ্ধের পরে ইংরেজদের বিরুদ্ধে হিন্দু-মুসলমান ফকির সন্ন্যাসীরা সশস্ত্র সংগ্রাম সংগঠিত করেন যা 'ফকির বিদ্রোহ' ও 'সন্ন্যাসী বিদ্রোহ' নামে খ্যাত। ১৭৬০ থেকে ১৮০০ সাল পর্যন্ত বৃহত্তর ঢাকা, ময়মনসিংহ, বগুড়া, রাজশাহী, রংপুর, দিনাজপুর অঞ্চলে এই আন্দোলন পরিচালিত হয় মজনু শাহ্, ভবানী পাঠক, মুসা শাহ্, মাদার বকস প্রমুখের নেতৃত্বে। মুখোমুখি সশস্ত্র যুদ্ধে ১৭৮৭ সালে মজনু শাহ্ নিহত হন। মজনু শাহ্র ফকির বিদ্রোহের ধারাবাহিকতায়ই ১৮৩২ অব্দে শেরপুরে পাগলপন্থীদের বিদ্রোহ শুরু হয়। শুধু ইংরেজ নয় তাদের দোসর এদেশীয় জমিদার, নায়েব, গোমস্তাদের বিরুদ্ধেও ছিল সেসব আন্দোলন।

মহামান্য এমামুযযামানের পূর্বপুরুষ দাউদ খান পন্নী ও মোঘল বাহিনীর মধ্যে সংঘটিত ঐতিহাসিক রাজমহলের যুদ্ধ। এই যুদ্ধে পরাজয়ের মাধ্যমেই বাংলার স্বাধীনতা সূর্য অস্তমিত হয় এবং দিল্লির শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। (তারিখ ই বাদাউনি)

হন। নারকেলবাড়িয়ায় নির্মিত তার বিখ্যাত বাঁশের কেল্লার সৈনিকদের হাতে ছিল দেশীয় কামারদের হাতে তৈরি অস্ত্র। উন্নত অস্ত্রে সজ্জিত ইংরেজ অশ্বারোহী ও গোলন্দাজ বাহিনী তার আন্দোলন নস্যাৎ করে দিলেও তিনি শোষিত নিপীড়িত মানুষের মধ্যে সংগ্রামের বীজ বপন করে দিয়ে যান।

ফরায়েজি আন্দোলনের নেতা হাজি শরিয়ত উল্লাহ (১৭৮২-১৮৪০) এবং তার পুত্র মোহসিন উদ্দীন দুদু মিয়া (১৮১৯-১৮৬০) ধর্ম সংস্কারের পাশাপাশি ঢাকা ও বৃহত্তর ফরিদপুর জেলায় দরিদ্র চাষী, তাঁতী ও অন্যান্য শ্রমজীবী মানুষকে নীলকর-জমিদারদের অত্যাচার ও শোষণের বিরুদ্ধে সংগঠিত করেন।

শেষ পর্যায়ে (১৮৫৯-৬০) অব্দে হলো নীল বিদ্রোহ। এই নীলচাষ প্রতিরোধ সংগ্রামের নায়কও ছিল বাংলার শোষিত কৃষকরাই। ১৭৮৩ সালে রংপুরের কৃষকরা প্রতিরোধ গড়ে তোলেন নূরুল আল দীনের নেতৃত্বে। পাবনার কৃষক বিদ্রোহও (১৮৭৩-৭৫) ইতিহাসের এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়।

ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে বড় আকারে বিদ্রোহ হয় ১৮৫৭ সালে যা মহাবিদ্রোহ নামেও খ্যাত। এ সময় জনতার অসন্তোষ সিপাহী বিদ্রোহের আকারে রূপ নেয়, যদিও তা চূড়ান্ত সফলতার মুখ দেখতে পায়নি। পরবর্তীতে বৃটিশ বিরোধী আন্দোলনকে রাজনৈতিক রূপ দেয়ার জন্য গঠিত হয় ভারতীয় কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ। এ দুটি

বলাকী শাহ নামক একজন ধর্মীয় নেতার নেতৃত্বে ১৭৯২-এ বাকেরগঞ্জ জেলার প্রজাগণ স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। মির্জা আগা মোহম্মদ রেজা বেগ ইংরেজ বিরোধী দুর্জয় আন্দোলন গড়ে তোলেন এবং ঘোষণা করেন স্বাধীনতা। এরপর আবির্ভাব ঘটে সৈয়দ নিসার আলী তিতুমীরের (১৭৮২-১৮৩১)। তিতুমীর ছিলেন রাজা রামমোহন রায়ের সমসাময়িক। তিনি শুধু ধর্ম সংস্কার আন্দোলন নয়, কোম্পানির কর্মচারী, ইংরেজ নীলকর ও জমিদারদের বিরুদ্ধে এক দুর্বার সশস্ত্র সংগ্রাম গড়ে তোলেন। তিনি শুরুতে ধর্ম সংস্কারে ব্রতী হন। ওহাবী আন্দোলন গড়ে তোলেন চব্বিশ পরগণা, নদীয়া, যশোর ফরিদপুর প্রভৃতি এলাকায়। তারপর তিনি দরিদ্র কৃষক, তাঁতী প্রভৃতি শোষিত শ্রেণির মানুষকে রাজনৈতিকভাবে সংগঠিত করতে থাকেন। বিভিন্ন এলাকায় তিনি তাদের নিয়ে ইংরেজ নীলকর ও বাঙালি জমিদারদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রামে লিপ্ত

দলের মাধ্যমে চলে রাজনৈতিক প্রচেষ্টা এবং অসহযোগ আন্দোলন। অবশেষে ১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্ট দ্বি-জাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে ভারতবর্ষ দু ভাগ হয়ে পাকিস্তান ও ভারত নামে দুটো স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্রের জন্ম হয়। ব্রিটিশদের প্রত্যক্ষ গোলামী থেকে আমাদের মুক্তি মেলে। মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভিত্তিতে ভারতবর্ষের পূর্ব ও পশ্চিম এর দুটো অংশ নিয়ে গঠিত হয় পাকিস্তান। এদেশের মানুষ প্রাথমিকভাবে এটাকে স্বাধীনতা হিসাবেই গ্রহণ করল। স্বপ্ন দেখল নতুন এক সমাজ প্রতিষ্ঠার যেখানে কোনো অন্যায়, অবিচার, শোষণ, বঞ্চনা থাকবে না, ন্যায় ও সত্য প্রতিষ্ঠিত হবে, সকলে ঐক্যবদ্ধভাবে দেশকে একটি সমৃদ্ধশালী, প্রগতিশীল উন্নত দেশ হিসাবে গড়ে তুলতে পারবে, সাম্য প্রতিষ্ঠিত হবে। পাকিস্তান যখন রাষ্ট্রের নাম দিল ইসলামী প্রজাতন্ত্র তখন এদেশের মানুষ ভাবল ইসলামের ন্যায়বিচার, সাম্য আর শোষণমুক্ত সমাজ

প্রতিষ্ঠিত হবে। কিন্তু সে স্বপ্ন স্বপ্নই থেকে গেল। তারা আসলে ইসলামকে কেবল ব্যবহার করেছিল। ইসলামের নাম দিলেও তারা ব্রিটিশদের মতোই শোষণ, বঞ্চনা, অন্যায়, অবিচার আর সীমাহীন দুর্নীতি চালাল। কিছুদিনের মধ্যেই আমাদের অবস্থা হলো ব্রিটিশ শাসনাধীন সময়ের চেয়েও ভয়াবহ।

পাকিস্তান শাসনামল (১৯৪৭-১৯৭১):

পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে দূরত্ব ছিল প্রায় দেড় হাজার মাইল। স্বাধীন হয়েও পূর্ব পাকিস্তান ধীরে ধীরে পশ্চিম পাকিস্তানের কলোনি হয়ে ওঠে। এখানকার বাঙালিরা আগের মতোই রয়ে গেল বঞ্চিত। তাদের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থার পরিবর্তন হলো না। কেবল অর্থনৈতিক শোষণ নয়, বাঙ্গালি সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের ওপরও নিপীড়ন শুরু হয়। বাংলার পরিবর্তে এই অঞ্চলের রাষ্ট্রভাষা উর্দু করার উদ্যোগ নেওয়া হয় যার ফলশ্রুতিতে রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবিতে ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে ছাত্র-জনতা। পুলিশের গুলিতে প্রাণ দেয় সালাম, রফিক ও জব্বাররা। আর পৃথিবীর ইতিহাসে স্থাপিত হয় একমাত্র জাতি হিসেবে মাতৃভাষার মর্যাদা রক্ষার জন্য প্রাণদানের অনন্য দৃষ্টান্ত। পরবর্তী উল্লেখযোগ্য ঘটনাগুলো ছিল-

এর পর ১৯৫৪ সালে নির্বাচনে মুসলিম লীগের বিপক্ষে যুক্তফ্রন্টের জয়, শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুক হকের চার সদস্যের যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা গঠন এবং ৩১ মে পাকিস্তানের গভর্নর জেনারেল গোলাম মোহাম্মদ যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিপরিষদ বাতিল করে দিয়ে প্রদেশে গভর্নরের শাসন প্রবর্তন করেন।

১৯৫৬ সালের ২৩ মার্চ পাকিস্তানের প্রথম শাসনতন্ত্র কার্যকর হয় এবং এ বছর পাকিস্তানকে ইসলামী প্রজাতন্ত্র হিসেবে ঘোষণা করা হয়।

১৯৫৮ সালে আইয়ুব খানের নেতৃত্বে সামরিক শাসন জারি করা হয়।

১৯৬২ সালে ছাত্রদের সামরিক শাসন বিরোধী আন্দোলন শুরু হয়।

১৯৬৬ সালে আওয়ামী লীগ নেতা শেখ মুজিবুর রহমান ছয় দফা দাবি নিয়ে পূর্ব পাকিস্তানে গণতন্ত্র ও স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠার আন্দোলন শুরু করেন।

১৯৬৮ সালে শেখ মুজিবুর রহমান, কিছু বাঙালি সাধারণ মানুষ এবং সেনা সদস্যের বিরুদ্ধে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা। ইতোমধ্যে কেন্দ্রীয় ছাত্র কমিটি তাদের ১১ দফা আন্দোলন শুরু করে।

১৯৬৯ সালে আইয়ুব বিরোধী গণঅভ্যুত্থান চরম রূপ নেয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র আসাদ, নবকুমার স্কুলের ছাত্র মতিউর রহমান এবং গণঅভ্যুত্থান চলাকালে ছাত্রদের রক্ষা করতে গিয়ে পাকিস্তানি সেনাদের গুলিতে শহীদ হন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ড. মুহাম্মদ শামসুজ্জোহা।

১৯৭০ সালে জেনারেল আইয়ুব খান জেনারেল ইয়াহিয়া খানের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করে সরে যান। চরম চাপের মুখে ইয়াহিয়া খান সাধারণ নির্বাচনের ঘোষণা দেন। সেই নির্বাচনে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগ পূর্ব পাকিস্তানের ১৬৯টি আসনের মধ্যে ১৬৭টি আসন পায়, যা সমগ্র পাকিস্তানের সর্বমোট ৩০০ আসনের মধ্যে সংখ্যাগরিষ্ঠ ছিল। তৎকালীন সামরিক সরকার ফলাফল মেনে নিলেও বিজয়ী দল আওয়ামী লীগের নিকট ক্ষমতা হস্তান্তরে টালবাহানা শুরু করে। তারা যে বাঙালিদেরকে কোনো অধিকারই দিবে না, এই ভূমিকে তারা কলোনি হিসাবেই রাখতে চায় তা পরিষ্কার হয়ে ওঠে।

১৯৭১ সালের ৭ মার্চ রেসকোর্স ময়দানে (বর্তমান সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) বঙ্গবন্ধু তাঁর ঐতিহাসিক ভাষণ প্রদান করেন। ঘোষণা করেন- "এবারের সংগ্রাম, আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম"।

সারাদেশ যখন ক্ষোভে উত্তাল তখন সামরিক বাহিনীতে চলতে থাকে ইতিহাসের জঘন্যতম গণহত্যার পূর্বপ্রস্তুতি। বেলুচিস্তানের কসাই হিসেবে পরিচিত জেনারেল টিক্কা খানকে পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর হিসেবে ঢাকায় প্রেরণ করা হয়।

অপারেশন সার্চলাইট:

১৯৭১, ২৫ মার্চ রাতে জেনারেল ইয়াহিয়া পাকিস্তানি বাহিনীকে বাঙ্গালি নিধনযজ্ঞের সবুজ সংকেত প্রদান করে সন্ধ্যায় গোপনে পশ্চিম পাকিস্তান যাত্রা করে। সে রাতেই পাকিস্তান বাহিনী শুরু করে 'অপারেশন সার্চলাইট' নামের হত্যাযজ্ঞ, যার উদ্দেশ্য ছিল বাঙ্গালিদের প্রতিরোধ গুঁড়িয়ে দেয়া। এরই অংশ হিসেবে সামরিক বাহিনীর বাঙ্গালি সদস্যদের নিরস্ত্র করে হত্যা করা হয়, নির্বিচারে হত্যা করা হয় সারা বাংলাদেশের অসহায় ও নিরপরাধ সাধারণ মানুষদের।

এরপরের ঘটনা সবারই জানা, দীর্ঘ ৯ মাস রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ, ৩০ লক্ষ শহীদ আর ৩ লক্ষ মা-বোনের সম্ভ্রমের বিনিময়ে অর্জিত হয় একখণ্ড মাটি, একটি নতুন স্বপ্ন, একটি নতুন দেশ, আমরা হই স্বাধীন।

স্বাধীন একটি জাতি হিসাবে আমরা কতটুকু এগিয়েছি:

১৯৭১ সাল থেকে আমরা স্বাধীন। ১ লক্ষ ৪৭ হাজার ৫৭০ বর্গকিলোমিটারের একটি উর্বর সোনা

১৯৭১ সালের ৭ মার্চ রেসকোর্স ময়দানে (বর্তমান সোহরাওয়াদী উদ্যান) বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ঐতিহাসিক ভাষণের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের ঘোষণা করেন।

ফলানো ভূখণ্ড আছে আমাদের। আছে বিরাট জনশক্তি (Man Power) যার বড় অংশই কর্মোদ্দমী যুবক। রয়েছে তেল-গ্যাস ও কয়লাসহ বিভিন্ন খনিজ সম্পদ, মৎস্য সম্পদ। বিজ্ঞান ও তথ্য-প্রযুক্তির এই যুগে, গতি-প্রগতির এই যুগে এই বিরাট জনশক্তি, খনিজ সম্পদ আর উর্বর মাটির এই দেশের জন্য ৪৫ বছর নেহায়েত অল্প সময় নয়। এই বিরাট সময়ে আমরা যদি একটি ঐক্যবদ্ধ, ন্যায়নিষ্ঠ, দেশপ্রেমে উজ্জীবিত, দুর্নীতিমুক্ত জাতি গঠন করতে পারতাম তাহলে আমরা হতাম পৃথিবীর অন্যতম একটি পরাশক্তি। আমাদের শিক্ষার হার বেড়েছে, জিডিপি বেড়েছে, মাথাপিছু আয় বেড়েছে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বেড়েছে, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান বেড়েছে, আমরা মধ্যম আয়ের দেশ হবার জন্য লড়াই করছি, উন্নত দেশ হবার স্বপ্ন দেখছি- অর্থাৎ আমরা কিছুটা পথ এগিয়েছি উন্নতির দিকে কিন্তু গতি-প্রগতির এই যুগে ৪৫ বছরে আমাদের এই এগিয়ে যাওয়াটা মোটেও যথেষ্ট নয়।

অর্থনীতির মাপকাঠিতে, শিক্ষা-স্বাস্থ্যের মাপকাঠিতে আমরা কিছুটা সামনের দিকে অগ্রসর হয়েছি বটে কিন্তু পরিসংখ্যান বলছে ঘুষ, দুর্নীতি, দ্বন্দ্ব, সংঘাত, খুন, ধর্ষণ, নারী-নির্যাতন, অন্যায়-অশান্তি বহুগুণে বৃদ্ধি পেয়েছে। সমাজে ন্যায়, সুবিচার, সাম্য ও শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়নি। এখন আমাদের ভেবে দেখার সময় এসেছে কেন আমরা এতদিনেও উন্নত দেশ গঠন করতে পারলাম না, কেন আমরা ন্যায়, সুবিচার, সাম্য ও শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে পারলাম না, কেন আজও আমাদের দেশে জঙ্গি হামলা, সাম্প্রদায়িক সহিংসতার ঘটনা ঘটে চলেছে।

বর্তমান সঙ্কট:

তৃতীয় বিশ্বের অন্যতম ঘনবসতিপূর্ণ ও প্রকৃতিক দুর্যোগকবলিত দেশ হিসাবে নানারকম সমস্যা ও সঙ্কটের মধ্য দিয়েই আমাদের সময় অতিবাহিত করতে হয়। কিন্তু কিছু সমস্যা, কিছু সঙ্কট দেশের অস্তিত্বের জন্য, দেশের শান্তি-শৃঙ্খলার জন্য, জাতীয় নিরাপত্তার জন্য হুমকি হয়ে দাঁড়ায়। বর্তমানে জঙ্গিবাদ ও সাম্প্রদায়িকতা আমাদের দেশের জন্য এমনই এক সঙ্কট হয়ে দাঁড়িয়েছে। গত কয়েক বছর ধরে ধারাবাহিকভাবে ব্লগার, প্রকাশক, বিদেশি নাগরিক, ধর্মগুরু হত্যার ঘটনা আমাদের দেশে জঙ্গিবাদের অস্তিত্বের জানান দিচ্ছিল। সর্বশেষ গত রমজান মাসে গুলশানের হলি আর্টিজনের নৃশংস হত্যাকাণ্ড ও ঈদুল ফিতরের দিন শোলাকিয়ার ঈদের জামাতের অদূরের হামলা বাংলাদেশে জঙ্গি উত্থানের বিষয়টি নিশ্চিত করে। অপরদিকে সম্প্রতি নাসিরনগরে সংখ্যালঘুদের উপর হামলাসহ বিভিন্ন সময়ে সারা দেশে সাম্প্রদায়িক যে হামলাগুলো হয়েছে তাও আমাদের জন্য একটি বড় সঙ্কট হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমাদেরকে মনে রাখতে হবে জঙ্গিবাদ এবং সাম্প্রদায়িকতা আমাদের মতো দেশের জন্য কোনো মামুলি সঙ্কট নয়। এই জঙ্গিবাদ এবং সাম্প্রদায়িকতার গোড়া একই জায়গা। দুটোই সৃষ্টি করা হয় ধর্মবিশ্বাসকে ভুল খাতে প্রবাহিত করে। আর এই জঙ্গিবাদে আক্রান্ত হয়েই মধ্যপ্রাচ্যের একটির পর একটি মুসলিম দেশ যুদ্ধভূমিতে পরিণত হয়েছে, ধ্বংস হয়ে গেছে। আমাদের দেশেও জঙ্গিবাদের উত্থান একটি বৈশ্বিক ষড়যন্ত্রের অংশ। কাজেই এই সঙ্কট নিয়ে আমাদেরকে ভাবতে হবে।

এখন আমাদের করণীয়:

আমরা যদি দেশকে ভালোবাসি, দেশের মানুষকে ভালোবাসি তবে দেশকে যাবতীয় ষড়যন্ত্র ও সঙ্কটের হাত থেকে বাঁচানোর জন্য এগিয়ে আসতে হবে। প্রথমে উপলব্ধি করতে হবে কেন আমরা ৪৫ বছরেও আমাদের দেশকে একটি উন্নত রাষ্ট্রে পরিণত করতে পারলাম না, কেন স্বাধীনতার পরও দেশে ন্যায়, সুবিচার, সাম্য, অর্থনীতিক মুক্তি আনতে পারলাম

না, কেন আমরা দুর্নীতিমুক্ত, দাঙ্গা-হাঙ্গামা, ভ্রাতৃঘাতী সংঘাতমুক্ত, সন্ত্রাস-চাঁদাবাজমুক্ত, জঙ্গিবাদ-সাম্প্রদায়িকতামুক্ত শান্তিপূর্ণ সোনার বাংলাদেশ গড়তে পারলাম না। আমাদেরকে আরও ভাবতে হবে এখন যদি আমরা যাবতীয় সমস্যা থেকে দেশকে উদ্ধার করতে চাই তবে আমাদের করণীয় কী।

একটা পরিবার, সংগঠন, সমাজ বা রাষ্ট্রের উন্নয়নের সর্বপ্রথম শর্ত হলো তার সদস্যদের মধ্যে ঐক্য। ঐক্য ছাড়া বড় কোনো লক্ষ্যে পৌছানো সম্ভব নয়। একটি জাতির সকল মানুষ যদি ঐক্যবদ্ধ হয় তাহলে তারা যে কোনো লক্ষ্য অর্জন করতে পারে। এর উদাহরণ ১৯৭১। এদেশের কৃষক, তাঁতি, মুটে, ছাত্র- শিক্ষকসহ ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সর্বস্তরের জনগণ সেদিন শান্তিময় দেশের স্বপ্ন বুকে নিয়ে পাক-বাহিনীর অন্যায়, অবিচারের বিরুদ্ধে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল এবং স্বাধীনতার সূর্য ছিনিয়ে এনেছিল। কিন্তু পরবর্তী ৪৫ বছরে সেই ঐক্য আমরা দুর্ভাগ্যক্রমে ধরে রাখতে পারি নি। ধর্মব্যবসায়ী শ্রেণির ফতোয়াবাজি, অপরাজনীতি আর পশ্চিমা পরাশক্তিগুলোর ষড়যন্ত্রের শিকার হয়ে আমরা হাজারো ভাগে বিভক্ত হয়ে হানাহানি, মারামারি, দলাদলি, হত্যা-রক্তপাতে নিমজ্জিত হয়ে গিয়েছি। আজও আমরা তৃতীয় বিশ্বের একটি দরিদ্র দেশ হয়ে আছি। অতীতের সেই ব্যর্থতাকে পেছনে ফেলে যদি আমরা নতুন করে সিদ্ধান্ত নিই যে, আমরা একটি সমৃদ্ধ ও শক্তিশালী জাতিসত্তায় পরিণত হব, তাহলে আমাদেরকে সেই শাশ্বত, চিরন্তন প্রাকৃতিক নিয়মটি কাজে লাগাতে হবে-অর্থাৎ একাত্তরের ন্যায় ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে ষোল কোটি বাঙালিকে আবার ঐক্যবদ্ধ হতে হবে।

আমাদের দেশে প্রায় ৮৫ শতাংশ মানুষ মুসলমান। তাদের হৃদয়ের গভীরে ধর্মবিশ্বাস প্রথিত। তাদের এই ধর্মবিশ্বাসকে পুঁজি করে এক শ্রেণির ধর্মব্যবসায়ী মানুষ নিজেদের স্বার্থ হাসিল করেছে। এই ধর্মবিশ্বাসের অপপ্রয়োগ থেকেই জন্ম নিয়েছে জঙ্গিবাদ, সাম্প্রদায়িকতা, ধর্ম নিয়ে অপরাজনীতি। ধর্মের অপব্যবহার করেই মানুষের মাঝে প্রথম বিভাজনের রেখা টানা হয়েছে। আর বিভাজনের আরেকটা কারণ হলো- পশ্চিমা পরাশক্তিদের ষড়যন্ত্রে নানা মতপথের রাজনৈতিক দলের সৃষ্টি। ব্রিটিশ আমলে তারা আমাদেরকে শাসন করেছে ভাগ কর শাসন কর (Devide and Rule) নীতি অনুসারে। যখন তারা আমাদেরকে আপাতঃ স্বাধীনতা দিয়ে চলে গেল তখনও যেন আমরা বিভাজিত থাকি আর তাদের মুখাপেক্ষী হয়ে থাকি এজন্য প্রথম বিভাজন করা হলো- দ্বিজাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে দেশ বিভাগ এবং দেশের মধ্যে বিভিন্ন রাজনৈতিক মতবাদের সৃষ্টি। সেই মতবাদগত বিভাজনের ধারাবাহিকতা আমরা আজও বয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছি। রাজনীতিক গোলোযোগের কারণে আমাদের দেশে প্রায়ই ভয়াবহ সহিংস পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়, জীবনযাত্রা স্তব্ধ হয়ে যায়, দেশ ও জাতি চরমভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। আন্দোলনের নামে সহিংসতা সৃষ্টির যে ধারা আমাদের দেশে চালু আছে তার খেসারত দিতে হয় সাধারণ মানুষকেই। তাই সাধারণ মানুষকেই সচেতন হতে হবে যেন ভবিষ্যতে আর এ ধরনের অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনার পুনরাবৃত্তি না হয়। আমরা চাইলেই এটা সম্ভব, তবে আমাদেরকে এ বিষয়ে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। বিচ্ছিন্ন জনগোষ্ঠী সংখ্যায় যত বৃহৎই হোক তারা প্রকৃতপক্ষে শক্তিহীন। তাদের অনৈক্যের সুযোগ নিয়েই কতিপয় সুবিধাবাদী দুস্কৃতকারী যুগের পর যুগ সমাজে অশান্তি সৃষ্টি করে যায়। কিন্তু আর নয়। আমরা ষোল কোটি মানুষ যদি সর্বপ্রকার অপরাজনীতি, জঙ্গিবাদ, ধর্মব্যবসায়ীদের উসকানির বিরুদ্ধে গণপ্রতিরোধ গড়ে তুলি তাহলে কোনো ষড়যন্ত্রকারীই আর এ জাতির ক্ষতিসাধন করতে পারবে না।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে আমরা কিসের ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ হব?

আমাদেরকে অবশ্যই ন্যায় ও সত্যের ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। অন্যায়, অসত্য, বিভক্তি সৃষ্টিকারী উপাদানগুলো যথা ধর্মব্যবসা, জঙ্গিবাদ, সন্ত্রাসবাদ, অপ-রাজনীতি, পশ্চিমা সভ্যতার চাপিয়ে দেওয়া অনৈক্য সৃষ্টিকারী মতবাদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। অন্যায়, অসভ্যতা, মিথ্যার পক্ষ ত্যাগ করতে হবে কেননা এগুলো কখনোই মানুষকে শান্তি দিতে পারে না। সেই সত্য ও ন্যায় কী তা স্রষ্টা যুগে যুগে নবী-রসুল-অবতারদের মাধ্যমে জানিয়ে দিয়েছেন। এমনই এক মহাসত্য হচ্ছে, আমরা সমস্ত মানবজাতি এক স্রষ্টার সৃষ্টি, এক পিতা-মাতা আদম-হাওয়ার সন্তান। সুতরাং আমরা এক পরিবার, আমরা প্রত্যেকে ভাই-ভাই।

আমাদেরকে মনে রাখতে হবে, এই সমাজে আমরা বড় হয়েছি, এর প্রতি আমাদের দায়িত্ব রয়েছে। আমাদেরকে স্বার্থপরতা, আত্মকেন্দ্রিকতা পরিহার করতে হবে। যে শুধু নিজের স্বার্থে কাজ করে, মানুষের কল্যাণের জন্য একটি কুটাও নাড়তে চায় না, একটা টাকা খরচ করতে চায় না- সে মানুষ নয়, সে পশুরও অধম। মানবজাতির কল্যাণে নিজেদের জীবন ও সম্পদকে উৎসর্গ করতে পারার মধ্যেই নিহিত আছে মানবজন্মের সার্থকতা। একাত্তরে মুক্তিযোদ্ধারা যেমন নিঃস্বার্থভাবে এ দেশের মানুষের মুক্তির জন্য জীবন উৎসর্গ করেছিলেন, আজ ৪৫ বছর পরে আবারও প্রয়োজন একটি শান্তিময়, ন্যায়বিচারপূর্ণ সমাজ প্রতিষ্ঠায় আমাদের নিঃস্বার্থ আত্মনিয়োগের।

ফিরে দেখা ২০১৬

বিশ্বের আলোচিত ঘটনা

আতাহার হোসাইনঃ

নতুন শতাব্দীটা শুরুই হয়েছে ব্যাপক চাঞ্চল্য নিয়ে। সর্বত্র অস্থিরতা, যুদ্ধ, সহিংসতা, রাজনৈতিক উত্থান-পতন। যেন সিনেমার ক্লাইমেক্স মুহূর্ত। যেন সবকিছু একটা পরিসমাপ্তির দিকে ধাবিত হচ্ছে। তিন ঘণ্টার সিনেমায় একটা সমাপ্তি থাকলেও বাস্তবতার রঙ্গমঞ্চে যবনিকা হয়তো খুব শীঘ্রই আমরা দেখতে পাব না। কারণ, পৃথিবীর ধ্বংস পর্যন্ত কাহিনীর বাঁক বদলাতেই থাকবে, সংঘর্ষ চলতে থাকবে। আর সত্য-মিথ্যার সংঘাতই হচ্ছে মানবজাতির প্রকৃত ইতিহাস। একারণে প্রতিনিয়ত নতুন নতুন ঘটনাও ঘটে চলবে। এভাবেই প্রতি বছরের শেষ প্রান্তে বসে আমরা বিগত বছরের একটা সালতামামী তৈরিতে মনোযোগ দিতে থাকব। কি পেলাম, কি হারালাম তার হিসেব কষব। যাই হোক, ২০১৬ খ্রিষ্টাব্দটি সত্যিই ঘটনাবহুল একটি বছর। উত্থান-পতন, দুঃখ, যন্ত্রণা, অত্যাচার, অবিচার, সহিংসতা, হৃদয়ের দংশন, আর্তমানবতার হাহাকার নিয়ে অতিবাহিত হলো এই বছরটি। আসছে নতুন বছর। কি পরিবর্তন নিয়ে আসছে তা আমরা জানি না। তবুও নতুন কিছু ঘটবে, মানবতা মুক্তি পাবে, আরো জেগে উঠবে মানুষ এই প্রত্যাশা আমাদের। ফিরে যাওয়া যাক পেছনের দিকে।

উত্তর কোরিয়ার হাইড্রোজেন বোমা পরীক্ষাঃ

২০১৬ নতুন বছরের জানুয়ারির ৬ তারিখে হাইড্রোজেন বোমার একটি ক্ষুদ্র সংস্করণের সফল পরীক্ষা চালানোর দাবি করে উত্তর কোরিয়া। এদিন সকালে দেশটির পুংগাই-রি এলাকায় একটি পরমাণু কেন্দ্রের কাছে ৫ দশমিক ১ মাত্রার একটি ভূ-কম্পন শনাক্ত হওয়ার কিছুক্ষণের মধ্যেই খবরটি ঘোষণা করে উত্তর কোরিয়া। এ নিয়ে ২০০৬ সাল থেকে এ পর্যন্ত চার দফা পরমাণু অস্ত্রের পরীক্ষা চালালো কূটনৈতিকভাবে বিচ্ছিন্ন দেশটি। পুরো ঘটনা ইঙ্গিত করে যে বিশ্ববাসীর চাপ সত্ত্বেও দেশটি পরমাণু কর্মসূচি থেকে সরে আসেনি, অদূর ভবিষ্যতে তেমন কোনো সম্ভাবনাও নেই।

বুরহান ওয়ানী হত্যা ও কাশ্মীরে নজীরবিহীন বিক্ষোভঃ

কাশ্মীর উপত্যকাকে ঘিরে ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে ১৯৪৭ সাল থেকে চলে আসছে বিরোধ। উপত্যকাটির মালিকানা দুটি দেশই দাবি করে

আসছে। এ নিয়ে অসংখ্য ছোট ছোট সংঘর্ষ এবং তিনটি বড় যুদ্ধ হয়ে গেছে। জম্মু ও কাশ্মীরের অশান্তির ফলে অতীতে হাজার হাজার মানুষ মারা গেছে যারা প্রায় সকলেই মুসলমান। বিশেষ করে কাশ্মীরে ভারতীয় সেনার নির্যাতনের শিকার হয়েছেন অধিক সংখ্যক মুসলমান। গত ৮ জুলাই কাশ্মীরি স্বাধীনতাকামী (ভারতের চোখে সন্ত্রাসী) বুরহান ওয়ানী নামে এক তরুণ যোদ্ধাকে ভারতীয় সেনাবাহিনী অভিযান চালিয়ে হত্যা করে। এ হত্যাকাণ্ডকে কেন্দ্র করে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে পুরো কাশ্মীর উপত্যকা। নজীরবিহীন বিক্ষোভ, অসহযোগ আন্দোলন চলতে থাকে ভারতীয় কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে। বিক্ষোভ দমনে ভারতীয় নিরাপত্তাবাহিনী প্রচণ্ড শক্তিপ্রয়োগ করে। এতে প্রায় ২ মাসের অধিক সময়কাল ধরে ৮৭ জনের অধিক মানুষ মারা যায় এবং আহত হয় আরো বহুগুণ। বিক্ষোভ দমন করতে ব্যবহার করা পেলেট গানে চিরতরে চোখ হারান অনেকে।

ফ্রান্সে বাস্তিল দিবস উৎসবে ট্রাক হামলাঃ

২০১৬ সালে ১৪ জুলাই, বৃহস্পতিবার রাত ১০টার পর মোহামেদ লাউয়েজ বুলে নামে এক ৩১ বছর বয়সী ফ্রান্কো-তিউনিসীয় নাগরিক বাস্তিল দিবসে একটি ৩২ টন ওজনের ভারী ট্রাক নিয়ে ফ্রান্সের নিস শহরের এক সড়কে উৎসবে মাতোয়ারা জনতার উপর দিয়ে চালিয়ে নিয়ে যান প্রায় ২ কিলোমিটার। এর ফলে ৮৪ জনের মৃত্যু হয় ও ২০২ জন আহত হয়। আহতদের মধ্যে ৫২ জনের আঘাত গুরুতর। নিহতদের মধ্যে ১০ জনেরও বেশি শিশু। এটি ২০১৫ সালের জানুয়ারি ও নভেম্বরে ঘটে যাওয়া হামলার পর ফ্রান্সের বুকে তৃতীয় জঙ্গি হামলা।

তুরস্কে সামরিক অভ্যুত্থানের প্রচেষ্টাঃ

১৫ জুলাই তুরস্কে ডানপন্থি সরকারকে হঠাতে সেনাবাহিনীর অভ্যুত্থান ঘটে। এদিন সন্ধ্যায় হঠাৎ করেই সেনাবাহিনীর একটি অংশ রাজধানীসহ দেশের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ এলাকায় অবস্থান নেয়। এরপর দেশটির প্রেসিডেন্ট রিস্যাপ তাইয়্যেব এরদোয়ান অবকাশে থাকার মধ্যেই ন্যাটো জোটভুক্ত দেশটির পরাক্রমশীল সেনাবাহিনীর একটি দল অভ্যুত্থান ঘটিয়ে দেশের শাসনভার নেওয়ার দাবি করে, যা দেশটির টেলিভিশনে প্রচার করা হয়। উপকূলের শহর মারমারিসে থাকা এরদোয়ান অভ্যুত্থানের খবর পেয়েই তার স্মার্টফোনের মাধ্যমে দেওয়া এক ভাষণে জনগণকে তা প্রতিরোধের আহ্বান জানান। এতে ব্যাপকভাবে সাড়া দিয়ে সরকারের পক্ষে রাজপথে অবস্থান নেয় জনতা। সামরিক বাহিনীর অস্ত্রের সামনে তারা প্রতিরোধ হয়ে দাঁড়ায়। দেখা যায় এক অভূতপূর্ব দৃশ্য। একসময় জনতা অভ্যুত্থানে অংশ নেওয়া বিদ্রোহী সামরিক সদস্যদেরকে ধরাশায়ী করে ফেলে। পরে পুলিশ তাদেরকে আটক করে।

ভারত-পাকিস্তানের যুদ্ধংদেহী অবস্থানঃ

১৮ সেপ্টেম্বর ভারত নিয়ন্ত্রিত কাশ্মীরের উরি সামরিক ব্রিগেড সদর দফতরে আত্মঘাতী জঙ্গি হামলায় অন্তত ১৮ জন ভারতীয় সেনা নিহত হয়। ভোর ৪টার দিকে এ হামলা চালানো হয়। এ সময় হামলাকারী ৪ জঙ্গিও নিহত হয়েছে। এ হামলার জন্য ভারত পাকিস্তানকে দায়ী করে। এ নিয়ে দুই দেশের মধ্যে উত্তেজনা সৃষ্টি হয়। সীমান্তে উভয় দেশ সৈন্য সমাবেশ ও বড় ধরনের যুদ্ধের প্রস্তুতি নিতে থাকে। পাশাপাশি সীমান্তবাহিনীর মধ্যে গুলি বিনিময়ের ঘটনাও ঘটে। এসব ঘটনায় দুই দেশের পক্ষেই বেশ কিছু সৈন্য নিহত হয়। আত্মঘাতী হামলার প্রতিশোধ নিতে ভারতীয় বাহিনীও সীমান্ত অতিক্রম করে রাতের অন্ধকারে সার্জিকেল স্ট্রাইক চালিয়ে পাকিস্তানের ১৫ সৈন্য হত্যার দাবি করে।

ইয়েমেনে জানাজা অনুষ্ঠানে সৌদি হামলাঃ

৮ অক্টোবর ২০১৬। ইয়েমেনে হুতি বিদ্রোহীদের এক নেতার বাবার জানাজা চলাকালে সৌদি বিমান হামলায় অন্তত ১৪০ জন নিহত হয়েছেন। দেশটির রাজধানী সানার একটি কমিউনিটি হলে জানাজার সময় ওই বিমান হামলা হয়। হামলায় আরো অন্তত ৫২৫ জন আহত হয়েছেন বলে জানায় জাতিসংঘ। আরব বিশ্বের অন্যতম দরিদ্র দেশ ইয়েমেনে সৌদি নেতৃত্বাধীন জোটের হামলা শুরুর পর থেকে দেশটিতে বিশৃঙ্খলা ও সংকট চরম আকার ধারণ করেছে। ২০১৫ সালের মার্চে হুতি বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে সৌদি জোট এ অভিযান শুরু করলেও এখনো দেশটির রাজধানী সানাসহ অধিকাংশ এলাকা বিদ্রোহীদের নিয়ন্ত্রণেই রয়েছে।

মিয়ানমারে রোহিঙ্গাদের উপর জাতিগত নিধনঃ

মিয়ানমারে সংখ্যালঘু রোহিঙ্গা মুসলিমদের উপর জাতিগতভাবে নিধন চলছে দীর্ঘদিন ধরে। দেশটির কর্তৃপক্ষ রোহিঙ্গা মুসলিমদেরকে নাগরিক হিসেবে স্বীকৃতি দিতে অস্বীকার করছে। এ জন্য জনগোষ্ঠীটি সব দিক দিয়ে বঞ্চনার শিকার হয়ে আসছে। গত ৯ অক্টোবর এক জঙ্গি হামলায় দেশটির সেনাবাহিনীর ৯ জন সৈন্য নিহত হয়। রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর মুক্তির লক্ষ্যে গঠিত রোহিঙ্গা সলিডারিটি অর্গানাইজেশনকে এই হামলার জন্য দায়ী করে মিয়ানমার সরকার ও সেনাবাহিনী। এরই জের ধরে নতুন করে রোহিঙ্গাদের উপর নেমে আসে সীমাহীন অত্যাচার। খুন, ধর্ষণ, হত্যা, ভয়াবহভাবে আক্রমণ চলতে থাকে তাদের উপর। এই নিপীড়ন চালানোর আগে রাখাইন প্রদেশে মানবাধিকার সংস্থা ও গণমাধ্যমকর্মীদের প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা জারি করে দেশটির সরকার। ফলে সেখানকার প্রকৃত চিত্র প্রকাশিত হচ্ছে না। তাও যতটুকু প্রকাশিত হচ্ছে এবং বাংলাদেশে পালিয়ে আসা লোকজনের বর্ণনায় যতটুকু বুঝা যাচ্ছে, সরকারি বাহিনীর হস্তক্ষেপেই এসব হত্যা, ধর্ষণ, অগ্নিসংযোগ ও লুটতরাজ পরিচালিত হচ্ছে। জাতিসংঘের শরণার্থী সংস্থা ইউএনএইসসিআরও বিষয়টি আমলে নিয়েছে। ইউএনএইচসিআরের কক্সবাজার অফিসের প্রধান কর্মকর্তা জন ম্যাককিসিক অভিযোগ করেছেন, মিয়ানমারের সরকার সে দেশের সংখ্যালঘু রোহিঙ্গা মুসলমানদের বিরুদ্ধে জাতিগত নিধন অভিযান চালাচ্ছে। বিবিসি বাংলাকে তিনি

জানান, মিয়ানমারের সেনাবাহিনী রোহিঙ্গা পুরুষদের হত্যা করছে, শিশুদের জবাই করছে, নারীদের ধর্ষণ করছে, বাড়ি-ঘরে অগ্নিসংযোগ এবং লুটতরাজ চালাচ্ছে। উল্লেখ্য, রোহিঙ্গা নির্যাতন এখনো অব্যাহত রয়েছে।

মার্কিন নির্বাচনঃ

প্রতিবারই যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচন বিশ্ববাসীর আগ্রহের কেন্দ্রবিন্দুতে অবস্থান করে। নির্বাচনের কয়েক মাস আগে থেকেই চলতে থাকে নানা ধরনের জল্পনা-কল্পনা। কে জিতবে, কে হারবে তা নিয়ে মার্কিন গণমাধ্যমগুলোর জরিপের পাশাপাশি আমাদের দেশের চা দোকানগুলোতেও চলতে থাকে আলোচনা। এবারের নির্বাচনে প্রার্থী মনোনীত হোন ডেমোক্রেট দলের পক্ষ থেকে ওবামা প্রশাসনের পররাষ্ট্রমন্ত্রী হিলারী ক্লিনটন। আর রিপাবলিকান দলের পক্ষ থেকে ধনাঢ্য ব্যবসায়ী ডোনাল্ড ট্রাম্প। মনোয়ন পাওয়ার বিতর্কে ডোনাল্ড ট্রাম্প বিভিন্ন আক্রমণাত্মক মন্তব্যের কারণে সমালোচিত হন। বিশেষ করে মুসলিম সম্প্রদায়, অভিবাসীদের ব্যাপারে তার পক্ষ থেকে কঠোর মনোভাব প্রকাশিত হয়। এ জন্য ট্রাম্পের নির্বাচিত হওয়ার সম্ভাবনা অভিবাসী ও যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসরত মুসলিম সম্প্রদায়ের এক আতঙ্কের কারণে পরিণত হয়। মিডিয়ার জরিপ, বিতর্কে বিজয়ী, বিশ্ব সম্প্রদায়ের সমর্থন পাওয়ার পরও সবাইকে তাজ্জব করে দিয়ে নির্বাচনে হেরে যান হিলারী ক্লিনটন। আগামী চার বছরের জন্য বিশ্বের সবচেয়ে ক্ষমতাধর রাষ্ট্র মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়েছেন ডোনাল্ড ট্রাম্প।

ইসরাইলে দাবানলঃ

নভেম্বর মাসের শেষদিকে ইসরাইলের উত্তরাঞ্চলীয় শহর হাইফাতে দাবানল সৃষ্টি হয়ে ব্যাপক ক্ষয়-ক্ষতি হয়। জেরুজালেমের শহরতলীর দুটি এলাকা এবং অধিকৃত পশ্চিমতীরে ইহুদি বসতি স্থাপনা তালমনের কাছে আগুন ছড়িয়ে পড়ে। টানা দুই মাসের খরার পর ২৪ নভেম্বর এ আগুন লাগে। চারদিন ধরে দেশটির বিভিন্ন অঞ্চলে দাবানলের আগুন জ্বলতে থাকে। এ ঘটনায় ঘর-বাড়ি ছেড়ে পালিয়ে যায় হাজার হাজার মানুষ। ইসরাইলী কর্তৃপক্ষ এই অগ্নিকাণ্ডকে কৃত্রিমভাবে আগুন লাগানো বলেও ধারণা করে। এ জন্য কেউ কেউ সংখ্যালঘু আরবদের দিকে সন্দেহের আঙ্গুল তোলে। তারা সন্দেহবশদ ১২ ব্যক্তিকে গ্রেফতার করেছে বলেও সংবাদ প্রকাশিত হয়। ইসরাইলে এর আগে ২০১০ সালেও অনুরূপ দাবানলের সৃষ্টি হয়। এবারে ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষসহ বিশ্বের বেশ কয়েকটি দেশ ইসরাইলের আগুন নেভানোর কাজে সহযোগিতা করে।

ফিদেল ক্যাস্ট্রোর মৃত্যুঃ

কিউবার সাবেক প্রেসিডেন্ট এবং কমিউনিস্ট বিপ্লবের নেতা ফিদেল ক্যাস্ট্রো। ২৫ নভেম্বর ২০১৬ খ্রিষ্টাব্দে ৯০ বছর বয়সী এ নেতার জীবনাবসান ঘটে। কিউবার দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলের ওরিয়েন্তে প্রদেশে ১৯২৬

ফিদেল ক্যাস্ট্রো (১৯২৬-২০১৬)

সালে জন্মগ্রহণ করেন ফিদেল ক্যাস্ট্রো। হাভানা বিশ্ববিদ্যালয়ে আইন বিষয়ে পড়ার সময় তার রাজনৈতিক জীবন শুরু। এরপর কিউবার রাজনীতিতে একজন বিখ্যাত ব্যক্তিতে পরিণত হন তিনি। তার রাজনৈতিক জীবন শুরু হয় প্রেসিডেন্ট ফালজেন্সিও বাতিস্তা এবং কিউবার উপর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাজনৈতিক প্রভাবের বিরুদ্ধে জাতীয়তাবাদী সমালোচনামূলক নিবন্ধ লিখে।

পরবর্তীকালে ক্যাস্ট্রো কিউবান বিপ্লবের মাধ্যমে ক্ষমতায় আসেন যা যুক্তরাষ্ট্রের মদদে চলা বাতিস্তার স্বৈরশাসনকে ক্ষমতাচ্যুত করে। এর কিছুদিন পরই ক্যাস্ট্রো কিউবার প্রধানমন্ত্রী হন। ১৯৬৫ সালে তিনি কিউবা কমিউনিস্ট পার্টির প্রধান হন এবং কিউবাকে একদলীয় সমজতান্ত্রিক দেশ হিসেবে রূপ দেন। প্রায় অর্ধ-শতাব্দী ধরে কিউবা শাসন করেছেন তিনি। ২০০৬ সালে শারীরিকভাবে অসুস্থ হয়ে পড়ার পর ২০০৮ সালে ছোট ভাই রাউল ক্যাস্ট্রোর কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করেন। এরপর জনসমক্ষে খুব কমই দেখা যেত তাকে। যুক্তরাষ্ট্র এবং এর কয়েকটি মিত্র দেশের কাছে হুমকিজনক বলে বিবেচিত ছিলেন লাতিন আমেরিকা ও আফ্রিকাসহ বিভিন্ন দেশের সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবীদের কাছে সমাদৃত ছিলেন তিনি।

তুরস্কে রাশিয়ান রাষ্ট্রদূত হত্যাঃ

১৯ ডিসেম্বর তুরস্কে নিয়োজিত রাশিয়ান রাষ্ট্রদূত আন্দ্রেই জি. কার্লভকে 'তুর্কিদের চোখে রাশিয়া' নামক একটি আলোকচিত্র প্রদর্শনীতে বক্তব্য প্রদানকালে অতিথি ও চলমান ক্যামেরার সামনেই হঠাৎ গুলি করা হত্যা করা হয়। পরে হত্যাকারীর চিৎকাররত বক্তব্য থেকে বোঝা যায় হত্যাকারী সিরিয়ার আলেপ্পোতে রাশিয়ার ভূমিকার কারণে ক্ষুব্ধ হয়েই এই হত্যাকাণ্ড ঘটিয়েছে। হত্যাকারী তুরস্কের একজন পুলিশ সদস্য। অবশ্য হত্যা করার সময় তিনি পুলিশের দায়িত্ব পালন করছিলেন না।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হতে ৩৫ রুশ কূটনীতিককে বহিষ্কার:

মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে নাক গলানোর অভিযোগ এনে শাস্তি হিসেবে যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থানরত ৩৫ জন রুশ কূটনীতিককে বহিষ্কার করেছে যুক্তরাষ্ট্রের বিদায়ী প্রেসিডেন্ট ওবামা ও তাঁর প্রশাসন। স্থানীয় সময় গত বৃহস্পতিবার ওয়াশিংটন ডিসি এবং সান ফ্রান্সিসকো কনসুলেটের এসব কূটনীতিক এবং তাদের পরিবারকে ৭২ ঘণ্টার মধ্যে নিজ দেশে ফিরে যাবার নির্দেশ দেয় মার্কিন সরকার। সেই সঙ্গে মেরিল্যান্ড এবং নিউ ইয়র্কে গোয়েন্দা তথ্য কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহৃত হতো এমন দুটি রুশ কম্পাউন্ডও বন্ধ করে দেয়া হবে বলে জানানো হয়। একই সাথে রুশ গোয়েন্দা সংস্থার সাথে সম্পৃক্ত নয়টি সংস্থা ও ব্যক্তির ওপরেও নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে।

ডেমোক্রেটিক পার্টি এবং হিলারি ক্লিনটনের নির্বাচনী প্রচারণা রুশ হ্যাকারদের কবলে পড়েছিল, এমন অভিযোগের প্রেক্ষাপটে প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা রাশিয়ার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেবার ইঙ্গিত দিয়েছিলেন। যদিও রাশিয়া এসব অভিযোগ নাকচ করে দিয়েছে। মার্কিন অর্থ মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, যুক্তরাষ্ট্রের নির্বাচন প্রক্রিয়াকে 'খেলো' করার চেষ্টার জন্য যারা দায়ী এসব পদক্ষেপ তাদের জন্যেই নেয়া হয়েছে। এক বিবৃতিতে বারাক ওবামা বলেছেন, রাশিয়ার কর্মকাণ্ডের ব্যাপারে সব মার্কিন নাগরিকেরই সচেতন থাকা উচিত। সেই সঙ্গে মার্কিন বিশেষজ্ঞদেরও রুশ সাইবার হামলার ঝুঁকি চিহ্নিত করা এবং তা থেকে রেহাই পাবার উপায় খোঁজার আহ্বান জানিয়েছেন।

দেশের আলোচিত ঘটনা

বায়োম্যাট্রিক পদ্ধতিতে সিম নিবন্ধনঃ

আইনশৃঙ্খলা রক্ষা, মোবাইল ফোনে হুমকি ও চাঁদাবাজি রোধ করতে ২০১৬ সালের ফেব্রুয়ারি মাস থেকে সব ধরনের মোবাইল ফোনের সিম বায়োম্যাট্রিক পদ্ধতিতে নিবন্ধন করার নির্দেশ দেয় ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয়। জটিল এই সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করতে অনেক ধরনের চ্যালেঞ্জ ও বিরোধিতার মুখেও শেষ পর্যন্ত সফলভাবে সব ধরনের সিম কার্ড নিবন্ধন সম্পন্ন হয়। কার্যক্রমটিকে সফল করতে নিবন্ধনহীন সব ধরনের সিমকার্ডের সংযোগ বন্ধ করে দেওয়া হয়। যে কারণে ব্যবহারকারীরা বাধ্য হয়ে নিবন্ধন করেন।

বাংলাদেশ ব্যাংকের রিজার্ভ চুরিঃ

গত ৪ ফেব্রুয়ারি যুক্তরাষ্ট্রের ফেডারেল রিজার্ভ ব্যাংকে রক্ষিত বাংলাদেশ ব্যাংকের বৈদেশিক মুদ্রার হিসাব থেকে ৮২০ কোটি টাকা চুরি করে নেয় একটি চক্র। এফবিআইয়ের সূত্রে পত্রিকা মারফত জানা যায়, হ্যাকাররা বাংলাদেশ ব্যাংকের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ হতে কমপক্ষে এক বিলিয়ন ডলার চুরি করার চেষ্টা করেছিল। যা বাংলাদেশি মুদ্রায় প্রায় ৮ হাজার কোটি টাকা। আন্তঃব্যাংক লেনদেনে ব্যবহৃত নেটওয়ার্ক ব্যবহার করে তারা চুরি করা টাকা ফিলিপাইনের ক্যাসিনোতে নিয়ে যায়। দুষ্কৃতিকারীরা যুক্তরাষ্ট্রের ফেডারেল রিজার্ভ ব্যাংকে থাকা বাংলাদেশ ব্যাংকের হিসাব থেকে দশ কোটি ডলার বা ৮২০ কোটি টাকা সরিয়ে নিতে সক্ষম হয়। পরবর্তীতে ২০ মিলিয়ন ডলার উদ্ধার করা সম্ভব হয় বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

সোনাইমুড়িতে হেযবুত তওহীদ সদস্যদের উপর বর্বরোচিত হামলাঃ

১৪ মার্চ ২০১৬ নোয়াখালী জেলার পোরকরা গ্রামে হেযবুত তওহীদের এমাম হোসাইন মোহাম্মদ সেলিম এর বাড়িতে একটি মসজিদ নির্মাণকে কেন্দ্র করে ধর্মব্যবসায়ী শ্রেণির আক্রমণে হেযবুত তওহীদের দুই কর্মীকে হাত-পায়ের রগ কেটে ও জবাই করে হত্যা করে ধর্মান্ধ উগ্রবাদীরা। পরে ঐ দুটো মৃতদেহে পেট্রোল ঢেলে আগুনে পুড়িয়ে দেওয়া হয়। এর আগে নির্মিতব্য মসজিদটিকে খ্রিষ্টানদের গির্জা আখ্যা দিয়ে স্থানীয় মসজিদের মাইক থেকে তা ধ্বংসের জন্য আহ্বান জানানো হয়। তারও কয়েকদিন আগে বেনামী ফতোয়া সম্বলিত একটি লিফলেট ছড়িয়ে এলাকায় হেযবুত তওহীদকে 'কুফরি সংগঠন' ফতোয়া দিয়ে মিথ্যাচার করা হয়। ঘটনার দিন মসজিদের মাইক, ফেসবুক থেকে প্রচার চালিয়ে মানুষকে উত্তেজিত করে তোলা হয়। দিনভর জড়ো হতে থাকা উত্তেজিত জনতাকে দিয়ে মসজিদ নির্মাণে স্বেচ্ছাশ্রম দিতে আসা হেযবুত তওহীদের সদস্যদের উপর আক্রমণ করা হয়। রাস্তায় গাছের গুড়ি ফেলে রাখায় হামলার সময় ঘটনাস্থলে স্থানীয় পুলিশ পৌঁছতে ব্যর্থ হলে উগ্রবাদীরা বিকেলের দিকে পূর্ণোদ্যমে হামলা করতে সমর্থ হয়। এরপরে প্রশাসনের টনক নড়ে। কিন্তু ততক্ষণে দুইজনের প্রাণহানি ঘটে যায়। এরপরেও সন্ত্রাসীরা থেমে থাকে নি। স্বেচ্ছাশ্রম দিতে আসা কর্মীসহ ঐ আন্দোলনটির আশেপাশের ১০৮ জন সদস্যকে তারা হত্যা করার চেষ্টা করে। পুলিশ নিরাপত্তা দেওয়ায় আক্রান্তদেরকে থানায় নিয়ে যাওয়ার পথে পুলিশসহ হেযবুত তওহীদের কর্মীদের উপর সন্ত্রাসী কায়দায় পুনরায় হামলা করে। এমনকি হেযবুত তওহীদের কর্মীদেরকে ছিনিয়ে নেওয়ার লক্ষ্যে তারা সোনাইমুড়ি থানায় পর্যন্ত হামলা চালায়। পুলিশ এখন পর্যন্ত চিহ্নিত হত্যাকারীদের গ্রেফতার করতে সমর্থ হয় নি।

১৪ মার্চ ২০১৬। নোয়াখালীর সোনাইমুড়িতে মসজিদ নির্মাণকে গীর্জা নির্মাণ বলে গুজব ছড়িয়ে জ্বালিয়ে দেওয়া হয় হেযবুত তওহীদ সদস্যদের বাড়ি-ঘর, ভেঙ্গে দেয়া হয় নির্মাণাধীন মসজিদ। এভাবেই হাত-পায়ের রগ কেটে, চোখ উপড়ে, জবাই করে হত্যা করা হয় তাদের দুই সদস্যকে। এমনকি পেট্রল ঢেলে জ্বালিয়ে দেওয়া হয় লাশ দু'টি।

যাদেরকে গ্রেফতার করা গেছে, তাদেরও প্রায় সবাই আলাদাত থেকে জামিনে ছাড়া পেয়ে গেছে। ঘটনাটি জাতীয় ও আন্তর্জাতিক মিডিয়ায় গুরুত্বের সাথে স্থান পায়।

তনু ধর্ষণ ও হত্যাঃ

গত ২০ মার্চ সন্ধ্যায় টিউশনি করে বাসায় ফেরার পথে নির্যাতনের পর কুমিল্লার ভিক্টোরিয়া কলেজের শিক্ষার্থী সোহাগী জাহান তনুকে হত্যা করে দুর্বৃত্তরা। ২১ মার্চ সন্ধ্যায় তনুকে তাদের গ্রামের বাড়ি জেলার মুরাদনগর উপজেলার মির্জাপুর গ্রামে দাফন করা হয়। এ বিষয়ে কুমিল্লা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের অফিস সহকারী তনুর বাবা ইয়ার হোসেন ২১ মার্চ অজ্ঞাতনামা আসামিদের বিরুদ্ধে কুমিল্লা কোতোয়ালি মডেল থানায় হত্যা মামলা দায়ের করেন। এ ঘটনায় সারাদেশে ব্যাপক তোলপাড় সৃষ্টি হয়। তনু হত্যার বিচারের দাবিতে সারাদেশে বিক্ষোভ সমাবেশ, মানববন্ধনসহ বিভিন্ন কর্মসূচি পালন করে বিভিন্ন সংগঠন। তবে ঘটনার নয় মাসেও হত্যাকাণ্ডের কোনো প্রকার কূল-কিনারা করতে পারেনি আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী।

রাষ্ট্র ধর্ম ইসলামঃ

১৯৮৮ সালের ৫ জুন হুসেইন মুহম্মদ এরশাদের শাসনামলে সংবিধানের অষ্টম সংশোধনীতে রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম জাতীয় সংসদে পাস করা হয়। ওই বছরের আগস্টে স্বৈরাচার ও সাম্প্রদায়িকতা প্রতিরোধ কমিটির পক্ষে সাবেক প্রধান বিচারপতি কামালউদ্দিন হোসেনসহ দেশের ১৫ বিশিষ্ট নাগরিক এর বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে হাইকোর্টে রিট আবেদন করেন। দীর্ঘদিন পর ২০১১ সালের ৮ জুন হাইকোর্টে একই বিষয়ে ফের সম্পূরক আরো একটি আবেদন করে রিটের শুনানির আবেদন করা হয়। পরে ওই আবেদনের শুনানি নিয়ে হাইকোর্টের একটি বেঞ্চ রুল জারি করেন। রুলে সংবিধানের অষ্টম সংশোধনীর মাধ্যমে ইসলামকে রাষ্ট্রধর্মের মর্যাদা দেওয়া কেন অবৈধ, বেআইনি ও অসাংবিধানিক ঘোষণা করা হবে না, তা জানতে চাওয়া হয়। ২৮ মার্চ, ২০১৬ আবেদনটি খারিজ করে দেওয়া হয়। এর আগে রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম বহাল রাখা না হলে ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দলগুলোর পক্ষ থেকে দেশ অচল করে দেওয়ার হুমকি-ধামকি উচ্চারিত হয়।

রাবি শিক্ষক রেজাউল করিম হত্যাঃ

চলতি বছরের ২৩ এপ্রিল রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের অধ্যাপক এ এফ এম রেজাউল করিম সিদ্দিকীকে কুপিয়ে হত্যা করে দুর্বৃত্তরা। রাজশাহী মহানগরীর শালবাগান এলাকায় বাড়ির কাছেই নির্মমভাবে কুপিয়ে তাকে খুন করা হয়। অধ্যাপক রেজাউল 'কোমলগান্ধার' নামে একটি সাহিত্য পত্রিকার সম্পাদক এবং 'সুন্দরম' নামে একটি সাংস্কৃতিক সংগঠনের উপদেষ্টা ছিলেন।

শিক্ষককে কান ধরে উঠ-বসঃ

গত ১৩ মে বন্দর উপজেলার পিয়ার সাত্তার লতিফ উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শ্যামল কান্তিকে মারধর করে স্থানীয় একদল লোক। পরে তাকে কান ধরিয়ে উঠ-বস করান স্থানীয় সাংসদ সেলিম ওসমান। শ্যামল কান্তির বিরুদ্ধে অভিযোগ তিনি ক্লাসে এক ছাত্রকে উদ্দেশ্য করে ইসলাম ধর্ম নিয়ে কটূক্তি করেন। এ ঘটনাকে কেন্দ্র করে পরবর্তীতে সারাদেশে ব্যাপক আলাচনা-সমালোচনা সৃষ্টি হয়। অনেকে প্রতীকিভাবে কান ধরে তোলা ছবি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে প্রকাশ করে ঘটনার প্রতিবাদ জানান।

হলি আর্টিজান ও শোয়ালাকিয়া হামলাঃ

১ জুলাই রাতে হলি আর্টিজান রেঁস্তোরায় সন্ত্রাসী হামলা চালানো হয়। হামলায় দেশি-বিদেশি ২০ জন এবং পুলিশের দুই কর্মকর্তা নিহত হন। নিহতদের মধ্যে ৯ ইতালীয়, ৭ জাপানি ও একজন ভারতের

বাংলাদেশের ইতিহাসে স্মরণকালের সবচেয়ে ভয়াবহ জঙ্গি হামলা হয় ১ জুলাই রাতে গুলশানের হলি আর্টিজান রেঁস্তোরায়। এ হামলায় দেশি-বিদেশি ২০ নাগরিক এবং পুলিশের দুই কর্মকর্তা নিহত হন।

নাগরিক। নিহত দুই পুলিশ কর্মকর্তা হলেন ডিএমপির গোয়েন্দা বিভাগের (ডিবি) সহকারী কমিশনার রবিউল ইসলাম ও বনানী থানার ওসি সালাহউদ্দিন। এ ঘটনায় রাতেই ইসলামিক স্টেট (আইএস) হামলার দায় স্বীকার করে। ঘটনার পরদিন সকালে আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীকে সঙ্গে নিয়ে 'অপারেশন থান্ডার বোল্ট' পরিচালনা করে সেনা কমান্ডোর একটি দল। কমান্ডো অভিযানে পাঁচ জঙ্গি নিহত হয়।

এদিকে গুলশান হামলার রেশ না কাটতেই ঈদুল ফিতরের দিন সকালে কিশোরগঞ্জের শোলাকিয়া ঈদগাহের নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা পুলিশ সদস্যদের ওপর বোমা হামলা এবং গুলিতে দুই কনস্টেবলসহ চারজন নিহত হন। আট পুলিশ সদস্যসহ আহত হন আরো ১৫ জন। তবে এ ঘটনায় জড়িত আটজনকে তাৎক্ষণিকভাবে আটক করা হয়। হামলার দিনই বন্দুকযুদ্ধে নিহত হয় আবীর রহমান নামে নব্য জেএমবির এক সদস্য। আহত অবস্থায় গ্রেফতার হয় শফিউল নামে আরেক জঙ্গি। পরবর্তীতে সেও র‍্যাব-জঙ্গি বন্ধুক যুদ্ধে নিহত হয়।

কল্যাণপুরে ৯ জঙ্গি হত্যাঃ

২৫ জুলাই রাতে রাজধানীর কল্যাণপুরে এক জঙ্গি আস্তানায় আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর অভিযানে গোলাগুলিতে নয়জন নিহত হয়। কল্যাণপুরের ৫ নম্বর সড়কের গার্লস হাই স্কুলের পাশে তাজ মঞ্জিল নামের ছয় তলা ওই ভবনকে স্থানীয়রা চেনেন 'জাহাজ বাড়ি' নামে, যেখানে বেশিরভাগ ফ্ল্যাট মেস হিসেবে ভাড়া দেওয়া হতো। ভবনের পঞ্চম তলায় জঙ্গিরা আস্তানা গেঁড়েছিল বলে পুলিশের দাবি। মধ্যরাতের পর পুলিশ ও র‍্যাবের প্রাথমিক অভিযান শুরু হয়। পরে সোয়াত বাহিনীর নেতৃত্বে 'অপারেশন স্টর্ম টোয়েন্টিসিক্স' নামে মূল অভিযান চলে ভোর ৫টা ৫১ মিনিট থেকে এক ঘণ্টা। এক সাথে এত সংখ্যক জঙ্গি হত্যার ঘটনা এর আগে দেশের কোথাও ঘটে নি। তবে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর এই অভিযানের বিশ্বস্ততা নিয়ে প্রশ্নের সৃষ্টি হয়। পুরো অভিযানে কোনো ধরনের মিডিয়ার উপস্থিতি ছিলো না।

নারায়ণগঞ্জে ৩ জঙ্গি হত্যাঃ

২৭ আগস্ট নারায়ণগঞ্জ শহরের পাইকপাড়ায় আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর অভিযানে তিন জঙ্গি নিহত হয়। তাদের মধ্যে ছিলেন গুলশানে জঙ্গি হামলার অন্যতম পরিকল্পনাকারী তামিম চৌধুরী। এদিন সকালে পাইকপাড়ার বড় কবরস্থান এলাকার একটি তিনতলা ভবন ঘিরে অভিযান শুরু করে ডিএমপির কাউন্টার টেররিজম অ্যান্ড ট্রান্স ন্যাশনাল ইউনিট। তাদের সঙ্গে যোগ দেয় সোয়াট। সহযোগিতা করে র‍্যাব-১১ ও নারায়ণগঞ্জ জেলা পুলিশ। সকাল সাড়ে নয়টার পর ভবনের কাছ থেকে প্রথম গুলির শব্দ শুনতে পাওয়া যায়। এরপর থেমে থেমে গোলাগুলি হয়। বড় ধরনের বিস্ফোরণের শব্দও শোনা যায়। ঘণ্টাখানেক পর অভিযানের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়। পরে ঘটনাস্থলে উপস্থিত পুলিশের মহাপরিদর্শক সাংবাদিকদের ব্রিফ করেন। তিনি জানান, অভিযানে নব্য জেএমবির তিন জঙ্গি নিহত হয়েছে। পুলিশের কাছে তামিমের যে ছবি রয়েছে, তার সঙ্গে নিহত একজনের চেহারা হুবহু মিলে গেছে।

এমসি কলেজছাত্রী খাদিজার উপর হামলাঃ

৩ অক্টোবর সিলেটের এমসি কলেজ ক্যাম্পাসের পুকুর পাড়ে এক ছাত্রলীগ নেতা ধারালো অস্ত্র দিয়ে উপর্যুপরি কুপিয়ে গুরুতর আহত করে কলেজটির ছাত্রী খাদিজা আক্তার নার্গিসকে। ওই সময়ে অনার্স দ্বিতীয় বর্ষের পরীক্ষা দিয়ে বের হয় খাদিজা। পরে আশঙ্কাজনক

গত ২৮ অক্টোবর পবিত্র ক্বাবা ঘরের ছবিতে হিন্দুদের দেবতার ছবি বসিয়ে এক হিন্দু যুবকের ফেসবুক আইডিতে পোস্ট করার প্রতিক্রিয়ায় নাসিরনগর উপজেলার কয়েকটি গ্রামে সংখ্যালঘু হিন্দু সম্প্রদায়ের উপর হামলা, ভাঙচুর, মূর্তি ভাঙ্গার ঘটনা ঘটে।

অবস্থায় তাকে সিলেট এমএজি ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল ও পরে তাকে ঢাকায় এনে স্কয়ার হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। চিকিৎসকগণ তার বেঁচে থাকার ব্যাপারে সংশয় প্রকাশ করলেও দীর্ঘ চিকিৎসার পর সুস্থ হয়ে উঠেন এই তরুণী। হামলাকারী ছাত্রলীগ নেতা বর্তমানে বিচারাধীন অবস্থায় জেল-হাজতে রয়েছে।

নাসিরনগরের সংখ্যালঘুদের উপর হামলাঃ

গত ২৮ অক্টোবর মুসলিম সম্প্রদায়ের পবিত্র ক্বাবা ঘরের ছবিতে হিন্দুদের দেবতার ছবি বসিয়ে এক হিন্দু যুবকের ফেসবুক আইডিতে পোস্ট করার প্রতিক্রিয়ায় নাসিরনগর উপজেলার কয়েকটি গ্রামে সংখ্যালঘু হিন্দু সম্প্রদায়ের উপর হামলা, ভাঙচুর, মূর্তি ভাঙ্গার ঘটনা ঘটে। রসরাজ নামের এক ব্যক্তির ফেসবুক প্রোফাইল থেকে ছবিটি প্রকাশিত হলে পরের দিন নাসিরনগর সদর উত্তাল হয়ে পড়ে। এ অবস্থায় ৩০ অক্টোবর উপজেলা সদরের কলেজ মোড়ে বিক্ষোভ ও প্রতিবাদ সমাবেশ হয়। সমাবেশ চলাকালে বেশ কয়েকটি মন্দির ও হিন্দুদের বাড়িতে হামলা চালায় উত্তেজিত জনতা। হামলার ঘটনার পেছনে ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দল আওয়ামী লীগের স্থানীয় রাজনীতিবিদদের বিরুদ্ধে অভিযোগ ওঠে। এ ঘটনায় মন্দিরের পুরোহিত বাদী হয়ে দুই হাজার ৫০০ জনকে আসামি করে দুটি মামলা করেন। এ ছাড়া পুলিশ বাদী হয়ে ৩০০ জনকে আসামি করে আরো দুটি মামলা করে।

প্রধানমন্ত্রীর বিমানে যান্ত্রিক ক্রটিঃ

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে বহনকারী বিমান বোয়িং ৭৭৭-ইআর ৩০০ উড়োজাহাজ 'রাঙ্গা প্রভাত' গত ২৭ নভেম্বর ৯টা ১৪ মিনিটে হাঙ্গেরির রাজধানী বুদাপেস্টের উদ্দেশে হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর ত্যাগ করে। ৩৬ হাজার ফুট উচ্চতা দিয়ে ৮৫০ কিলোমিটার গতিতে উড়ন্ত অবস্থায় উড়োজাহাজের মনিটরের মাধ্যমে বাম দিকের ট্যাংকিতে ইঞ্জিন জ্বালানির পরিমাণে গরমিল ধরা পড়ে। ইঞ্জিনের তেলের পরিমাণ হ্রাসের পাশাপাশি এয়ার প্রেসারও দ্রুত কমতে থাকে। এই অবস্থায় ক্যাপ্টেন উড়োজাহাজটি ৩৬ হাজার ফুট থেকে ৩০ হাজার ফুটে নামিয়ে আনেন। পরে ক্যাপ্টেন গতিপথ পরিবর্তন করে নিকটবর্তী তুর্কমেনিস্তানের আশগাবাদ আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে ফ্লাইটটি জরুরি অবতরণ করান। তদন্ত কমিটি এই ক্রটিকে মনুষ্য সৃষ্ট ক্রটি হিসেবে চিহ্নিত করে দায়ীদের বিরুদ্ধে মামলা করেছে।

নারী জঙ্গি আত্মঘাতী বিস্ফোরণ:

গত ২৩ ডিসেম্বর, শুক্রবার রাত ১২টায় গোপন সংবাদের ভিত্তিতে পুলিশের সিটিটিসি ইউনিট দক্ষিণখান থানার পূর্ব আশকোনার ৫০ নম্বর বাড়িতে জঙ্গি আস্তানায় অভিযান চালায়। অভিযানে এক নারী ও এক কিশোর জঙ্গি নিহত হয়। পুলিশের আহ্বানে সাড়া দিয়ে আত্মসমর্পণ করে দুই নারী ও তাদের দুই সন্তান। তবে এই অভিযানে একজন জঙ্গি নারী আত্মঘাতী হয়, যা আমাদের দেশে সম্পূর্ণ ব্যতিক্রমী একটি ঘটনা। নিহত ঐ নারী জঙ্গির আত্মঘাতী বোমা বিস্ফোরণে আহত হয় তার শিশুকন্যা। শিশুটিকে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

রোহিঙ্গা নির্যাতন ও মুসলিম জাতির করণীয়

রিয়াদুল হাসান

রোহিঙ্গা মুসলিমদের উপর বার্মিজ সেনাবাহিনীর পাশবিক আক্রমণ, নারী-শিশু-বৃদ্ধ নির্বিশেষে গণহত্যা, ধর্ষণ, অগ্নিসংযোগ, লুটপাটের নির্মম চিত্র দেখে তাবৎ পৃথিবীর মানুষ আজ স্তম্ভিত, হতবাক।

দক্ষিণে বাংলাদেশের শেষ সীমানা টেকনাফের নাফ নদী। এই নদীটি পেরোলেই মিয়ানমারের রাখাইন রাজ্য। বাংলাদেশসহ সারা পৃথিবীর মানুষের দৃষ্টি এখন এই রাখাইনে। কারণ ঠিক এই মুহূর্তে সেখানে মানবজাতির ইতিহাসে আরেকটি কলঙ্কজনক অধ্যায় রচিত হচ্ছে। দেশ-কাল সম্পর্কে ন্যূনতম খোঁজ-খবর রাখেন যারা তাদেরকে বলে দিতে হবে না নাফ নদীর ওপারে কী অবর্ণনীয় দুর্দশা নেমে এসেছে সেখানকার হাজার বছরের ঐতিহ্যবাহী জনগোষ্ঠী রোহিঙ্গা মুসলিমদের জীবনে। বার্মিজ সেনাবাহিনীর পাশবিক আক্রমণ, নারী-শিশু-বৃদ্ধ নির্বিশেষে গণহত্যা, ধর্ষণ, অগ্নিসংযোগ, লুটপাটের নির্মম চিত্র দেখে তাবৎ পৃথিবীর মানুষ আজ স্তম্ভিত, হতবাক। যথারীতি এবারও এই নির্যাতনের ঢেউ এসে লেগেছে বাংলাদেশের সীমান্তে।

সাম্প্রতিক রোহিঙ্গা সঙ্কটের সূত্রপাত:

গত ৯ অক্টোবর বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী মিয়ানমারের তিনটি নিরাপত্তা চৌকিতে সন্ত্রাসী হামলা হয়। এতে মিয়ানমারের ৯ জন পুলিশ অফিসার নিহত হয়। হামলাকারী কারা তা স্পষ্টভাবে জানা যায় নি। তবে বিগত দিনগুলোতে দেখা গেছে- 'আরাকান আর্মি' নামক বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী রাখাইনদের স্বাধীনতাকামী একটি সশস্ত্র সংগঠন প্রায়ই মিয়ানমারের সরকারি বাহিনীর সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়ে থাকে। সে হিসেবে সাম্প্রতিক হামলাটি তারাই চালিয়ে থাকতে পারে। কিন্তু মিয়ানমারের সেনাবাহিনী এই সন্ত্রাসী হামলার দায় চাপিয়ে দিয়েছে রোহিঙ্গা মুসলিমদের উপর। এরপর হামলাকারীদের খোঁজে 'ক্লিয়ারেন্স অপারেশন' এর নাম করে শুরু হয় সেনাবাহিনীর নারকীয় তাণ্ডব। কয়েকদিনের ভেতরেই রোহিঙ্গাদের গ্রামগুলোতে রক্তগঙ্গা বইয়ে দেয় সেনাবাহিনী। শত শত মানুষকে এক জায়গায় জড় করে পেট্রল ঢেলে আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে দেওয়া হয়। পরিবারের সদস্যদের সামনেই রোহিঙ্গা মুসলিম মেয়েদের ধর্ষণ করা হয়। এমনকি রেহাই পাচ্ছে না কোলের শিশুরাও। বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে যাওয়া তরুণীদের লাশ পাওয়া যাচ্ছে রাস্তা কিংবা জঙ্গলের ধারে। বাড়িতে আগুন দিয়ে তার মধ্যে ছুড়ে ফেলা হচ্ছে অবুঝ শিশুদের। গত দুই মাসে নিহত হয়েছে কয়েক শ' রোহিঙ্গা। কয়েক হাজার ঘরবাড়ি-মসজিদ ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগ করা হয়েছে। দুই মাসেই নতুন করে উদ্বাস্তু হয়েছে ৪০ হাজার লোক। যুদ্ধক্ষেত্রের মতো হেলিকপ্টার গানশিপ থেকে নির্বিচারে গুলি চালানো হচ্ছে রোহিঙ্গাদের ওপর। ফলে জান বাঁচাতে রোহিঙ্গাদের সামনে এখন একটাই রাস্তা- নাফ নদী পেরিয়ে কোনোরকম বাংলাদেশে প্রবেশ করা। বিভিন্ন সূত্র মোতাবেক, গত কয়েক সপ্তাহে অন্তত ২২ হাজার রোহিঙ্গা উদ্বাস্তু হয়ে নতুন করে বাংলাদেশে আশ্রয় নিয়েছে।

রোহিঙ্গা সঙ্কট: বাংলাদেশ জড়িত যেভাবে

বস্তুত রোহিঙ্গাদের ভূ-রাজনৈতিক ইতিহাস ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের সাথে বাংলাদেশের রয়েছে অবিচ্ছিন্ন সম্পর্ক। রোহিঙ্গারা ধর্মে মুসলমান, আমাদের দেশেরও অধিকাংশ মানুষ মুসলমান। তারা কথা বলে অনেকটা কক্সবাজারের স্থানীয় ভাষার মতো করে। ইতিহাসে যখনই এই রোহিঙ্গারা কোনো আধিপত্যবাদী শক্তির নির্যাতনের শিকার হয়েছে তারা বাংলাকেই তাদের নিরাপদ আশ্রয়স্থল ভেবে জানের মায়ায় ছুটে এসেছে বাংলাদেশে। যে শাসকই বাংলা শাসন করুক মানবিক কারণে রোহিঙ্গাদের প্রতি কেউ নিষ্ঠুর হতে পারেন নি। এই ধারা এখনও অপরিবর্তিত রয়েছে। এই মুহূর্তে বাংলাদেশে প্রায় পাঁচ লাখ রোহিঙ্গা মুসলমান আশ্রিত রয়েছে যারা বিগত দশকগুলোতে রাখাইনে প্রবল নির্যাতনের মুখে বাংলাদেশে পালিয়ে আসতে বাধ্য হয়েছে। পরবর্তীতে মিয়ানমার সরকার আর তাদেরকে স্বদেশে ফিরিয়ে নেয় নি। বাংলাদেশে আশ্রিত এই লাখ লাখ রোহিঙ্গাদের নিয়ে বর্তমানে এমনিতেই বাংলাদেশ নানামুখী সমস্যার মুখে আছে। দেখা যাচ্ছে তাদের মধ্যে অনেকে জঙ্গিবাদী কর্মকাণ্ডের দিকে ঝুঁকে পড়ছে, কেউ মাদকব্যবসায় জড়িত হয়ে পড়ছে, কেউ অবৈধভাবে বাংলাদেশের নাগরিকত্ব নিয়ে বিদেশে চলে যাচ্ছে। বিদেশে গিয়ে তাদের কেউ যখন অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত হয় তার ক্ষতিকর প্রভাব পড়ে বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতিতে। সব মিলিয়ে রোহিঙ্গা ইস্যুটি বাংলাদেশের গলার কাঁটা হয়ে দাঁড়িয়েছে। উপেক্ষাও করা যায় না, আবার এভাবে চলতে দেওয়াও যায় না। এরই মধ্যে পুনরায় হত্যাযজ্ঞ শুরু হওয়ায় হাজার হাজার রোহিঙ্গা মিয়ানমার ছেড়ে বাংলাদেশে অনুপ্রবেশের চেষ্টা চালাচ্ছে। অর্থাৎ সমাধান হবে কি, সঙ্কট ক্রমশই আরও ঘনীভূত হচ্ছে।

মিয়ানমার সরকার ও রাখাইনের বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী মগ সম্প্রদায়ের দাবি হলো- রোহিঙ্গারা মিয়ানমারের নাগরিক নয়, তারা 'বহিরাগত' 'বিদেশি' ইত্যাদি। মিয়ানমার সরকার 'রোহিঙ্গা' শব্দ ব্যবহারে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে বলে দিয়েছে- এরা বাঙালি। অথচ 'রোহিঙ্গা' জাতিটি ভাষাভিত্তিক স্বতন্ত্র একটি জাতিগোষ্ঠী, আরাকানে যাদের ইতিহাস হাজার বছরেরও বেশি। তারা বাঙালি নয়, তারা রোহিঙ্গা। এই হাজার বছরের ইতিহাসকে অস্বীকার করে রাখাইনে সরকারি বাহিনী যে নারকীয় তাণ্ডব শুরু করেছে তার উদ্দেশ্য আর কিছু নয় রোহিঙ্গাদেরকে আরাকান ছেড়ে বাংলাদেশে চলে যেতে বাধ্য করা। আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমগুলো এখন খোলাখুলিভাবেই বলছে রাখাইনে এখন যা চলছে তা জাতিগত নিশ্চিহ্নকরণ অভিযান (Ethnic cleansing) ছাড়া কিছু নয়।

এখন বাংলাদেশ কী করবে? দুই ধরনের মতামত চড়াও আছে। একদল জাতীয় স্বার্থকে বড় করে দেখছেন। রোহিঙ্গারা বাংলাদেশে প্রবেশ করুক তা তারা চান না। এ ইস্যুটিকে এড়িয়ে যাওয়াকেই তারা সমীচীন মনে করছেন। অন্যদিকে ধর্মভিত্তিক দলগুলো রোহিঙ্গাদের প্রতি নির্যাতনের ঘটনায় বিক্ষোভ, মিছিল, সমাবেশ ইত্যাদি করে চলেছে। তাদের মধ্যে অনেকে রোহিঙ্গাদের জন্য সীমানা খুলে দেওয়ার পক্ষে, কারণ রোহিঙ্গারা মুসলমান। মুসলমান না হয়ে অন্য কোনো ধর্মের লোক হলে হয়ত তাদের মতামত অন্যরকম হতে পারতো। যাহোক- বাস্তবতা হচ্ছে বাংলাদেশ যদি রোহিঙ্গাদের জন্য সীমান্ত খুলে দেয় তবে তা মিয়ানমার সরকারের অন্যায় দূরভিসন্ধিই বাস্তবায়িত হবার সুযোগ করে দিবে। তখন রোহিঙ্গাদের প্রতি নির্যাতনের মাত্রা আরও বাড়তে থাকবে যতক্ষণ না তারা সবাই রাখাইন ছেড়ে বাংলাদেশে চলে আসে। অন্যদিকে সীমান্ত বন্ধ করে রাখাও অস্বস্তিকর, অমানবিক। একটি জনগোষ্ঠীকে নির্বিচারে হত্যা করা হবে, স্বামীর সামনে স্ত্রীকে ধর্ষণ করা হবে, স্ত্রীর সামনে স্বামীকে জীবন্ত আগুনে পুড়িয়ে ফেলা হবে, ক্ষেত-খামার জ্বালিয়ে দেওয়া হবে, ধন-সম্পদ লুট করে নেওয়া হবে, বাড়িঘর থেকে উচ্ছেদ করা হবে, অতঃপর তারা যখন আশ্রয়ের আশায় আমাদের সীমান্তে পাড়ি জমাবে তখন আমাদের সীমান্তরক্ষী বাহিনী ঐ নিপীড়িত মানুষগুলোর আর্তনাদ উপেক্ষা করে পুনরায়

আরবীয় মুসলমদের জাহাজ কুলে ভিড়লে 'রহম' 'রহম' ধ্বনি দিয়ে স্থানীয় জনগণের সাহায্য কামনা করতে থাকে। রহম থেকে রোয়াং এবং রোয়াং থেকে রোহাংগ, রোসাঙ্গ ও রোহিঙ্গা শব্দের উৎপত্তি হয়েছে বলে অনেকে মনে করে।

ঐ নরপশুদের কাছেই ফেরত পাঠাবে, নদীতে ভাসিয়ে দিবে, অবুঝ শিশুর মরদেহ পানিতে ভাসবে- এ তো হতে পারে না। তাহলে কী করণীয়? হ্যাঁ, করণীয় আছে। সেটা বলার জন্যই এই লেখাটির অবতারণা। কিন্তু তার আগে আসুন জেনে নেই রাখাইনে আজকের এই হতভাগা রোহিঙ্গা মুসলিমদের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস।

কারা এই রোহিঙ্গা?

মিয়ানমার সরকারের দাবি হচ্ছে রোহিঙ্গারা রাখাইনের কোনো ঐতিহ্যবাহী নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠী নয়, তারা সম্পূর্ণ বহিরাগত একটি জনগোষ্ঠী যারা ব্রিটিশ শাসনামলে রাখাইনে বসতি গড়ে তুলেছিল। এটা নির্ঘাত একটি অপপ্রচার। দশকের পর দশক ধরে এই অপপ্রচার চালানো হয়েছে। এত জোরেশোরে চালানো হয়েছে যে, ইতিহাস সম্পর্কে অনভিজ্ঞ অনেকেই তা বিশ্বাসও করে ফেলেছেন। এটা দুঃখজনক। বর্তমানে রাখাইন মিয়ানমারের একটি প্রদেশ হলেও রোহিঙ্গাদের এই আবাসভূমি এক কালে ছিল স্বাধীন-স্বতন্ত্র রাজ্য। এই রাজ্যটিকে আরাকানও বলা হয়ে থাকে। আরাকানে রোহিঙ্গাদের ইতিহাস অতি প্রাচীন। এতদঞ্চলে প্রথম ইসলাম ধর্মের আগমন ঘটে অষ্টম-নবম শতাব্দীতে। তখন আরাকান শাসন করত চন্দ্র বংশীয় হিন্দু রাজারা। এই বংশের রাজধানী ছিল উজালী, বাংলা সাহিত্যে যা বৈশালী নামে পরিচিত। এ বংশের উপাখ্যান রাদ জা-তুয়েতে নিম্নরূপ একটি আখ্যান উল্লেখ আছে- কথিত আছে, ''এ বংশের রাজা মহত ইং চন্দ্রের রাজত্ব কালে কয়েকটি বাণিজ্য বহর রামব্রী দ্বীপের তীরে এক সংঘর্ষে ভেঙ্গে পড়ে। জাহাজের আরবীয় আরোহীরা তীরে এসে ভিড়লে রাজা তাদের উন্নততর আচরণে সন্তুষ্ট হয়ে আরাকানে বসতি স্থাপন করান। আরবীয় মুসলমানগণ স্থানীয় রমণীদের বিয়ে করেন এবং স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন।'' জনশ্রুতি আছে, আরবীয় মুসলমানেরা ভাসতে ভাসতে কুলে ভিড়লে 'রহম' 'রহম' ধ্বনি দিয়ে স্থানীয় জনগণের সাহায্য কামনা করতে থাকে। রহম অর্থ দয়া করা। কিন্তু জনগণ মনে করে এরা রহম জাতির লোক। রহম শব্দই বিকৃত হয়ে রোয়াং এবং রোয়াং থেকে রোহাংগ, রোসাঙ্গ ও রোহিঙ্গা শব্দের উৎপত্তি হয়েছে বলে অনেকে মনে করে।

১৪০৬ সালে বার্মার রাজা আরাকান আক্রমণ করে আরাকানের ম্রাউক-উ রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা নরমিখলাকে ক্ষমতাচ্যুত করে। নরমিখলা ক্ষমতাচ্যুত হয়ে বাংলার তৎকালীন রাজধানী গৌড়ে পলায়ন করেন। সেখানে তিনি ইসলামী সভ্যতার সাথে পরিচিত হন এবং প্রবলভাবে ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হন। ২৪ বছর তিনি গৌড়ে কাটিয়েছিলেন। এরপর গৌড়ের শাসক জালালুদ্দিন শাহ নরমিখলার সাহায্যে ৫০ হাজার সৈন্য পাঠিয়ে বর্মী রাজাকে উৎখাতে সহায়তা করেন। নরমিখলার সাথে জালালুদ্দিন শাহ'র চুক্তি হয়েছিল যে, বর্মিজদের হাত থেকে মুক্ত করে দিলে নরমিখলার শাসনাধীন আরাকান গৌড়ের করদ রাজ্য হিসেবে থাকবে। সে মোতাবেক নরমিখলা মোহাম্মদ সোলায়মান শাহ নাম নিয়ে আরাকানের সিংহাসনে বসেন ১৪৩০ সালে। তিনি যে রাজবংশের পত্তন করেন সেটাই ইতিহাসের ম্রাউক-উ রাজবংশ নামে সুপরিচিত। যে ৫০ হাজার সৈন্য নরমিখলার হারানো রাজ্য পুনরুদ্ধারের জন্য আরাকানে পাঠানো হয়েছিল তারা আর গৌড়ে ফিরে যায় নি, আরাকানেই ম্রাউক-উ রাজবংশের অধীনে চাকরি গ্রহণ করে স্থায়িভাবে বসবাস শুরু করে। গৌড়ের করদ রাজ্য হিসেবে ম্রাউক-উ রাজবংশ ১৪৩০ খৃষ্টাব্দ থেকে

১৫৩০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত আরাকান শাসন করে। এরপর ১৫৩০ সাল থেকে ১৭৮৪ সাল পর্যন্ত আরাকান স্বাধীন রাজ্য হিসেবে শাসিত হয়। এই সুদীর্ঘকাল (শেষের দিকে কয়েক বছর বাদ দিলে) আরাকান ম্রাউক-উ রাজবংশের শাসনাধীন ছিল। এ সময়ে প্রত্যেক রাজা নিজেদের বৌদ্ধ নামের সাথে একটি মুসলিম নাম ব্যবহার করেছেন। ফারসি সরকারি ভাষা হিসেবে চালু হয়। গৌড়ের মুসলমানদের অনুকরণে মুদ্রা প্রথার প্রবর্তন হয়। মুদ্রার একপিঠে রাজার মুসলিম নাম ও অভিষেক কাল এবং অপরপিঠে মুসলমানদের কলেমা আরবি হরফে লেখা হয়। রাজার সৈন্যবাহিনীতে অফিসার থেকে সৈনিক পর্যন্ত প্রায় সবাইকে মুসলমানদের মধ্য থেকে ভর্তি করানো হতো। মন্ত্রী পরিষদের অধিকাংশই মুসলমান ছিল। কাজী নিয়োগ করে বিচারকার্য পরিচালিত হতো। অপর এক রাজা সেলিম শাহ বার্মার মলমিন থেকে সুন্দরবন পর্যন্ত বিরাট ভূ-ভাগ দখল করে দিল্লীর মোগলদের অনুকরণে নিজেকে বাদশাহ উপাধীতে ভূষিত করেন। নিঃসন্দেহে তদানিন্তন শ্রেষ্ঠ সভ্যতা তথা মুসলিম আচার-আচরণ অনুকরণে এসে আরাকানের সমাজ জীবন পরিচালিত হয়েছে সুদীর্ঘ প্রায় চারশ' বছরকাল। আরাকানের বাংলা সাহিত্যে এই রাজ্যকে রোসাঙ্গ রাজ্য বলে উল্লেখ করা হয়েছে। উল্লেখ্য, মধ্যযুগে বাংলা সাহিত্যচর্চার একটি গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র ছিল রোসাং রাজ দরবার। মহাকবি আলাওল রোসাং দরবারের রাজ কবি ছিলেন। তিনি লিখেছিলেন মহাকাব্য পদ্মাবতী। এছাড়া সতী ময়না ও লোর-চন্দ্রানী, সয়ফুল মুল্ক, জঙ্গনামা প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থ রচিত হয়েছিল রোসাং রাজদরবারের আনুকূল্যে। অনেকে ধারণা করেন রোহিঙ্গা নামটি এসেছে আরাকানের রাজধানীর নাম ম্রোহং থেকে: ম্রোহং> রোয়াং> রোয়াইঙ্গিয়া> রোহিঙ্গা। সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই যে, আজকের রোহিঙ্গারাই ইতিহাস প্রসিদ্ধ রোসাঙ্গ সভ্যতার ধারক-বাহক। তবে এটা ভুললে চলবে না যে, নানা জাতির সংমিশ্রণে গড়ে উঠেছে এই রোহিঙ্গা জাতি।

ভাই আওরঙ্গজেবের সাথে ক্ষমতার দ্বন্দ্বে পরাজিত হয়ে মোগল যুবরাজ শাহ সুজা ১৬৬০ সালে সড়ক পথে চট্টগ্রাম-কক্সবাজার হয়ে আরাকানে পলায়ন করেন। তৎকালীন রোসাং রাজা চন্দ্র সুধর্মা বিশ্বাসঘাতকতা করে শাহ সুজা এবং তার পরিবারকে নির্মমভাবে হত্যা করেন। এর পর আরাকানে যে দীর্ঘমেয়াদী অরাজকতা সৃষ্টি হয় তার অবসান ঘটে বার্মার হাতে আরাকানের স্বাধীনতা হরণের মধ্য দিয়ে। ১৭৮৪ সালে বার্মার রাজা বোডপায়া আরাকান দখল করে নেয়। আরাকানীরা প্রথমে বর্মীদের স্বাগত জানালেও অচীরেই তাদের ভুল ভাঙ্গে। বর্মিজরা আরাকানের বৌদ্ধ, মুসলিম, উপজাতি নির্বিশেষে সকল সম্প্রদায়ের উপর এমন নির্যাতন চালাতে থাকে যে, লক্ষ লক্ষ মানুষ আরাকান ছেড়ে পালাতে বাধ্য হয়। এই উদ্বাস্তুদেরকে প্রধানত দুইভাগে ভাগ করা যায়। বৌদ্ধ মগ সম্প্রদায় ও মুসলিম রোহিঙ্গা সম্প্রদায়। এদের মধ্যে মুসলিম রোহিঙ্গা সম্প্রদায়ের সাথে চট্টগ্রামের স্থানীয় বাসিন্দাদের সাংস্কৃতিক ও নৃতাত্ত্বিক সম্পর্ক থাকায় তারা চট্টগ্রামে লোকালয়ে গিয়ে বসবাস শুরু করে। অন্যদিকে মগরা পার্বত্য এলাকায় ঘাঁটি গেড়ে থেকে স্বাধীনতার আশায় বর্মি বাহিনীর বিরুদ্ধে চোরাগোপ্তা হামলা পরিচালনা করতে থাকে।

এদিকে ব্রিটিশরা তখন বাংলা দখল করে নিয়েছে। একদিকে বাংলায় চলছিল ব্রিটিশ আগ্রাসন, আর আরাকানে (রাখাইন) চলছিল বার্মিজদের আগ্রাসন। এই উভয় আধিপত্যবাদী শক্তির গ্যাড়াকলে পড়ে আরাকানীরা আর স্বাধীনতা ফিরে পায় নি। বরং ১৮২৬ সালে বর্মিদের হটিয়ে ব্রিটিশরাই আরাকান দখল করে নেয় এবং আরও পরে ১৮৮৫ সালে বৃটিশরা সমগ্র বার্মাই দখল করে নেয়। যখন এটা নিশ্চিত হয়ে গেল যে, আরাকানীদের নিকট ভবিষ্যতে স্বাধীনতা ফিরে পাবার কোনোই সম্ভাবনা নেই এবং বৃটিশ শাসনামলে আরাকানের অরাজকতা অনেকাংশে দূর হয়েছে, কর্মসংস্থানের নতুন সুযোগ তৈরি হয়েছে, তখন রোহিঙ্গা-মগ-উপজাতি নির্বিশেষে যারা বর্মি বাহিনীর অত্যাচারে একদা আরাকান ছেড়ে বিভিন্ন সীমান্ত এলাকায় বসতি গড়ে তুলেছিল তারা পুনরায় তাদের পৈত্রিক নিবাসে ফিরে যেতে থাকে। স্বভাবতই স্বদেশ থেকে বিতাড়িত হওয়া রোহিঙ্গা মুসলমানেরাও আরাকানে ফিরে গিয়ে নতুনভাবে বসতি গড়ে তোলে। মনে রাখতে হবে- এই রোহিঙ্গারা কিন্তু অভিবাসী হিসেবে আরাকানে যায় নি, তারা ছিল স্বদেশ প্রত্যাবর্তনকারী জনগোষ্ঠী, আরাকান তথা রাখাইনে যাদের ইতিহাস হাজার বছরের পুরনো, যারা কিনা আরাকানী সভ্যতার (রোসাঙ্গ সভ্যতা) প্রধান ধারক ও বাহক।

বৃটিশরা চলে যাবার সময় আরাকানকে তুলে দিয়ে যায় সেই বর্মীদের হাতেই যাদের হাতে তখনও আরাকানের নিরীহ মানুষের রক্তের দাগ লেগে আছে। এবারও ব্যতিক্রম হলো না। দেড় শতাব্দী পরে এসে আরাকানের মুসলিমদের প্রতি পুনরায় নির্যাতনের খড়গ নেমে এল। ১৯৪৮ সালের সংবিধানে মিয়ানমার সেখানে বসবাসরত মুসলমানদের নাগরিক হিসেবে স্বীকার করে নিয়েছিল। সেখানে বেসামরিক প্রশাসন চালু ছিল ১৯৬২ সাল পর্যন্ত। তারপর সেনা-অভ্যুত্থান ঘটে। তখন সেনা শাসকেরাও ১৯৪৮ সালের সংবিধান মেনে নেন। কিন্তু ১৯৭৪ সালের নতুন

বৃটিশ আমলেও স্বাধীনতাহীন ছিল এই রোহিঙ্গারা।

সংবিধান অনুযায়ী, সামরিক শাসকেরা মুসলমানদের সে দেশের নাগরিক হিসেবে মেনে নিতে অস্বীকার করেন। ১৯৮২ সালে চালু হয় নতুন নাগরিকত্ব আইন। আর তাতে রোহিঙ্গা মুসলমানদের নাগরিকত্ব খারিজ করে দেয়া হয়। অনেক সংখ্যালঘু উপজাতিকে জাতিগতভাবে মিয়ানমারের নাগরিক হিসেবে স্বীকৃতি দিলেও আরাকানের ইতিহাসের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে থাকা 'রোহিঙ্গা' নামক জাতিটির নৃতাত্ত্বিক পরিচয়কে সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করা হয়। মিয়ানমারে 'রোহিঙ্গা' শব্দটিই এখন নিষিদ্ধ!

প্রায় অর্ধ-শতাব্দী ধরে বার্মা শাসন করে আসছে মিয়ানমারের সামরিক জান্তা। ক্ষমতা কুক্ষিগত করার জন্য এরা বার্মিজ জাতীয়তাবাদ এবং থেরাভেদা বৌদ্ধ ধর্মীয় মতবাদ ব্যাপকভাবে ব্যবহার করে থাকে। রোহিঙ্গাদের নির্যাতন ও নির্মূলের প্রশ্নে যেন সবাই একাট্টা। আজকে সারা পৃথিবী যখন রাখাইনে মিয়ানমার সেনাবাহিনীর পৈশাচিক গণহত্যা দেখে স্তম্ভিত, তখন মিয়ানমারের তথাকথিত গণতান্ত্রিক নেত্রী, শান্তিতে নোবেল বিজয়ী অং সান সুচি 'মানবতা' 'মানবাধিকার' আর 'গণতন্ত্রের' খোলস ঝেড়ে ফেলে সেনাবাহিনীর পক্ষে নিজের অবস্থান পাকাপোক্ত করেছে। রাখাইনে গণহত্যা, ধর্ষণ, লুটপাট আর উচ্ছেদ-অভিযান নাকি সেনাবাহিনী নিয়ম মেনেই করছে! হায়রে মানবতা! হায়রে মানবাধিকার!

এখন করণীয় কী?

আমরা যদি মনে করি রোহিঙ্গা সঙ্কট কেবল রোহিঙ্গাদের একার সমস্যা তাহলে ভুল হবে। মুসলিমদের উপর অকথ্য নির্যাতন কোথায় হচ্ছে না? সারা পৃথিবীতেই হচ্ছে। রাখাইন থেকে কাশ্মীর, জিনজিয়াং থেকে ফিলিস্তিন- সবখানেই জাতিগত পরিচয়ে মুসলিমরা আজ নির্যাতনের শিকার। আজও আফগানিস্তান, ইরাক, সিরিয়া, লিবিয়া, ইয়েমেনের মাটি সিক্ত হয়ে আছে মুসলিমদের রক্তে। এই মুহূর্তে বিশ্বে প্রায় ৬ কোটি মানুষ উদ্বাস্তু, যাদের প্রায় সবাই মুসলিম। রোহিঙ্গা নির্যাতন বিচ্ছিন্ন কোনো ঘটনা নয়, পৃথিবীময় চলা মুসলিম নির্যাতনেরই অংশমাত্র। সব একই সূত্রে গাঁথা। আসলে বিপদ কেবল রোহিঙ্গাদের নয়, বিপদ আমাদের সবার, বিশ্বের ১৬০ কোটি মুসলিম নামক জনসংখ্যার। সুতরাং আমাদেরকে সমস্যার গোড়ায় প্রবেশ করতে হবে। জানতে হবে কেন এই বিপর্যয়। কোথায় পথ হারিয়েছি আমরা। সমাধান কোন পথে।

বিশ্বের কোথাও মুসলিমদের উপর নির্যাতন হলেই মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশগুলোতে বিক্ষোভের ঝড় ওঠে। প্রতিবাদ মিছিল বের হয়। ঘেরাও, জ্বালাও-পোড়াও শুরু হয়। ফিলিস্তিনে ইজরাইল গণহত্যা চালালে অন্যান্য মুসলিম দেশে ইজরাইলের দূতাবাস ঘেরাও করা হয়। বিক্ষোভ দেখাতে গিয়ে উত্তেজিত মুসলমানরা নিজেরাই নিজেদের জাতীয় সম্পদ নষ্ট করে, নিজেদেরই আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর সাথে সংঘর্ষ করে হতাহত হয়। এসব করে ধর্মানুভূতির প্রকাশ ঘটানো যায় বটে, কিন্তু প্রতিকার আসে না। আবার দেখা যায় একটি দেশে অন্য ধর্মাবলম্বীদের দ্বারা মুসলিম সংখ্যালঘুরা হত্যাকাণ্ডের শিকার হলে তার প্রতিশোধস্বরূপ আরেক দেশে উত্তেজিত মুসলিমরা ঐ ধর্মের মানুষের উপর হামলা চালায়। ভারতে মুসলিম নির্যাতিত হলে বাংলাদেশে হিন্দুদের বাড়িঘরে হামলা

নির্বাচনের আগে এভাবে মুসলিমদের আশ্বস্ত করলেও তথাকথিত গণতন্ত্রের ধারক সুচির সুর এখন পাল্টে গেছে। আজকে সারা পৃথিবী যখন রাখাইনে মিয়ানমার সেনাবাহিনীর পৈশাচিক গণহত্যা দেখে স্তম্ভিত, তখন মিয়ানমারের তথাকথিত গণতান্ত্রিক নেত্রী, শান্তিতে নোবেল বিজয়ী অং সান সুচি 'মানবতা' 'মানবাধিকার' আর 'গণতন্ত্রের' খোলস ঝেড়ে ফেলে সেনাবাহিনীর পক্ষে নিজের অবস্থান পাকাপোক্ত করেছে।

হয়। মিয়ানমারে মুসলিম হত্যার প্রতিশোধ নিতে বাংলাদেশের বৌদ্ধ পল্লীতে হামলা হয়। এতে মুসলিমদের কোনো লাভ হয় কি? হয় না, হবার কথাও নয়। এ ধরনের ন্যাক্কারজনক ঘটনা আসলে মুসলিমবিরোধী সাম্প্রদায়িক শক্তির হাতকেই সুসংহত করে।

অনেকে মোনাজাত করেন যেন আল্লাহ তাঁর নিজ অনুগ্রহে মুসলিমদের অবস্থা পরিবর্তন করে দেন। অথচ আল্লাহ কোর'আনে বলেই দিয়েছেন- আল্লাহ কোনো জাতির অবস্থা পরিবর্তন করেন না, যে পর্যন্ত না তারা তাদের নিজেদের অবস্থা পরিবর্তন করে। (সুরা রাদ: ১১) গত শতাব্দীর মধ্যভাগে ইজরাইল যখন ফিলিস্তিনের মুসলমানদের উপর নির্যাতন শুরু করল, তখন থেকেই সারা পৃথিবীর মুসলমানরা ওয়াজ-মাহফিল-ঈদগাহে নিয়মিত মোনাজাত করে আসছে যে, হে আল্লাহ! ইজরাইলকে তুমি ধ্বংস করে দাও। এসব দোয়া-মোনাজাত যে আল্লাহর দরবারে কবুল হয় নি তা বলার অপেক্ষা রাখে না। আমরা যত মোনাজাত করেছি ইজরাইল নামক অবৈধ রাষ্ট্রটির আয়তন ততই বেড়েছে। উল্টো ফল হচ্ছে কারণ এসব প্রচেষ্টাহীন দো'য়া।

একইভাবে আমেরিকা যখন ইরাকে হামলা করল লাখ লাখ মানুষ সাদ্দামের বিজয়ের জন্য আল্লাহর কাছে মুনাজাত করেছিল। এই দোয়া-মোনাজাতেও কাজ হয় নি। তারপর গত এক যুগের মধ্যে একে একে সমগ্র মধ্যপ্রাচ্যকে চোখের সামনে জ্বলতে দেখেছি আমরা। লাখ লাখ মুসলমানকে নির্বিচারে হত্যা করা হয়েছে। মাইলের পর মাইল গ্রাম উজার করা হয়েছে। শহর-বন্দর ধ্বংস করে মরুর বালুর সাথে একাকার করে ফেলা হয়েছে। লাখ লাখ মুসলিম নারীর ইজ্জত হরণ করা হয়েছে। আমাদের হাজারো দোয়া-মুনাজাতেও এই নির্যাতন বন্ধ হয় নি। আমাদের কোনো বিক্ষোভ, কোনো প্রতিবাদ, কোনো ওজর-আপত্তি-আব্দার মানবাধিকারের ফেরিওয়ালাদের কর্ণকোটরেও পৌঁছে নি। যখন দেখা গেল অবস্থা এই, আমাদের কোনো প্রতিবাদ, কোনো বিক্ষোভে কাজ হচ্ছে না, পৃথিবীতে মুসলিম নামক জনগোষ্ঠীকে নিশ্চিহ্ন করে ফেললেও তাদের পক্ষে একটা 'টু' শব্দ করারও লোক নেই, তখন 'মরতে যখন হচ্ছেই বীরের মত মরব' এই চেতনা থেকে অনেক জায়গায় সশস্ত্র প্রতিরোধের চেষ্টা শুরু হলো। আরাকানেও কিন্তু তাই হয়েছে। রোহিঙ্গাদের মধ্যে গড়ে উঠেছে কিছু বিদ্রোহী সংগঠন। তবে প্রচণ্ড দমন-পীড়নের মুখে তাদেরকেও হার মানতে হয়েছে এবং সেটাই স্বাভাবিক। একই কথা প্রযোজ্য আফগান, সিরিয়া, ইরাক, লিবিয়া, ইয়েমেন, পাকিস্তানসহ সর্বত্র গড়ে ওঠা সশস্ত্র মুসলিম যোদ্ধাদের ক্ষেত্রে। নিঃসন্দেহে ওই পথ ভুল, ধ্বংসাত্মক ও আত্মঘাতী। কিছুদিন আগে আমাদের দেশের কিছু মুসলিম তরুণ জেহাদী জোশে ঢাকায় অন্তত বিশজন বিদেশিকে জবাই করে হত্যা করে। তাদের বক্তব্য অনেকটা এরকম যে, ''সিরিয়া-ইরাকে পশ্চিমারা নিরীহ বেসামরিক মুসলমানদেরকে হত্যা করছে, আমরা তাদের বেসামরিক মানুষ হত্যা করে প্রতিশোধ নিলাম।'' এই তরুণরা সহজ একটি সত্য অনুধাবন করতে পারল না যে, 'অন্যায়ের প্রতিবাদ কখনও অন্যায় দিয়ে হয় না।' ইসলাম ন্যায়ের ধর্ম। মুসলমানরা ন্যায়বিচার দিবে তাদের পরম শত্রুকেও- এটাই ইসলামের আদর্শ। সে আদর্শ ত্যাগ করে কাপুরুষের মতো নিরীহ মানুষ খুন করতে থাকলে মুসলিমদের উপর নির্যাতন বন্ধ তো হবেই না, বরং মুসলিমদের প্রতি অন্য ধর্মের মানুষের ঘৃণা সৃষ্টি হবে এবং এ ধরনের ঘটনায় সাম্রাজ্যবাদীরা নিরীহ

মুসলিমদেরকে নির্বিচারে হত্যা করার আরও অজুহাত পেয়ে যাবে। উল্লেখ্য, সম্প্রতি মিয়ানমার সেনাবাহিনী রোহিঙ্গাদের বিরুদ্ধে যে গণহত্যা শুরু করেছে তার সূত্রপাত কিন্তু একটি জঙ্গি হামলাকে কেন্দ্র করেই। অর্থাৎ বোঝা যাচ্ছে এ যাবৎকালে মুসলিমদের উপর নির্যাতন বন্ধের জন্য কার্যকরী কোনো উপায় অবলম্বন করা যায় নি। আমাদের বিক্ষোভ মিছিল, প্রতিবাদ সমাবেশ, লেখালেখি, প্রচারণা, লং মার্চ, দোয়া-মুনাজাত, এমনকি সশস্ত্র প্রতিরোধ- কিছুতেই কিছু হয় নি। ভাগ্যাহত মুসলিমদের ভাগ্যাকাশে শনির মেঘ ক্রমশই ঘন হচ্ছে। তাহলে উপায়? উপায় একটাই, আগে আমাদেরকে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। আমাদের নিজেদের মধ্যে হাজারো বিভেদের দেয়াল দাঁড়িয়ে গেছে। বহিঃশত্রুর আক্রমণ হবে না কেন? সে সুযোগ তো আমরাই দিয়ে রেখেছি। শতাব্দীর পর শতাব্দী আমরা নিজেরাই শিয়া-সুন্নিসহ হাজারো ফেরকা-মাজহাবে বিভক্ত হয়ে নিজেদের হাতে নিজেদেরকে হত্যা করে আসছি। এক আল্লাহ, এক রসুলের অনুসারী হয়েও আমরা আজ ধর্মীয়ভাবে হাজারো ফেরকা-মাজহাবে, আধ্যাত্মিকভাবে বিভিন্ন তরিকায়, রাজনৈতিকভাবে বিভিন্ন দল-উপদলে ও ভৌগোলিকভাবে বিভিন্ন রাষ্ট্রে বিভক্ত হয়ে একে অপরের বিরুদ্ধে কাঁঠালের আঠার মত লেগে আছি। শিয়া মরলে সুন্নি খুশি হয়, সুন্নি মরলে শিয়া খুশি হয়। সাম্রাজ্যবাদীরা শিয়া রাষ্ট্র ধ্বংস করলে সুন্নিরা সহযোগিতা করে, সুন্নি রাষ্ট্র ধ্বংস করলে শিয়া রাষ্ট্র ইন্ধন যোগায়। এই ভ্রাতৃঘাতি সংঘাত আজ আমাদেরকে সামষ্টিকভাবে মৃত্যুখাদের কিনারে এনে দাঁড় করিয়েছে। এখন শিয়ারও যে পরিণতি, সুন্নিরও তাই। শিয়া মসজিদ যেমন বোমা মেরে উড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে সুন্নিদের মসজিদও রক্ষা পাচ্ছে না। সিরিয়া, ইরাক, লিবিয়া, ইয়েমেন, মিয়ানমারের দিকে তাকিয়ে দেখুন, কে সরকারি দলের, কে বিরোধী দলের, কে শিয়া কে সুন্নি, কে হানাফি কে শাফেয়ী, কে মাদ্রাসা শিক্ষিত কে সাধারণ মাধ্যমে শিক্ষিত তা আর কেউ শুনতে চায় না। তাদের সবার এখন এক পরিচয়- গৃহহারা, স্বজনহারা, হতভাগা উদ্বাস্তু। সুতরাং নিজেদের স্বার্থে, মানবতার স্বার্থে, ধর্মের স্বার্থে দল-মত-ফেরকা-মাজহাব নির্বিশেষে পৃথিবীর ১৬০ কোটি মুসলিমের ঐক্যবদ্ধ হওয়ার কোনো বিকল্প নেই।

মহামতি বুদ্ধের শিক্ষা ছিল মানবতা, পৃথিবীর প্রতিটি প্রাণির সুখ কামনা এবং জীব হত্যা নিষিদ্ধ করা। অথচ আজকে বুদ্ধের অনুসারী দাবিদার 'অহিংস' বৌদ্ধ ভিক্ষুদের রক্ত পিপাসায় প্রতিনিয়ত প্রাণ দিতে হচ্ছে রোহিঙ্গা মুসলিমদের।

সারা পৃথিবীর মুসলিম জনগোষ্ঠীর প্রতি হেযবুত তওহীদের আহ্বান হচ্ছে, ''বাঁচার জন্য ঐক্যবদ্ধ হোন। অনেক হয়েছে। আর বিভেদের চর্চা করবেন না।' আমরা কোনো নির্দিষ্ট ফেরকা-মাজহাবে ঐক্যবদ্ধ হতে বলছি না, শিয়াকে সুন্নি হতে বলছি না বা সুন্নিকে শিয়া হতে বলছি না, আওয়ামী লীগকে বিএনপি হতে বলছি না বা বিএনপিকে আওয়ামী লীগ হতে বলছি না, আপনারা যার যার বিশ্বাস ও পছন্দ নিয়ে ব্যক্তিগতভাবে নিজেদের মতো থাকুন, কিন্তু জাতীয় স্বার্থে এক আল্লাহর তওহীদের ভিত্তিতে যাবতীয় ন্যায় ও সত্যের পক্ষে ঐক্যবদ্ধ হোন। আমাদেরকে শপথ নিতে হবে আমরা আল্লাহর তওহীদের ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ থাকব, একে অপরের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করব না, ঐক্য নষ্ট হয় এমন কাজ করব না বা এমন কথা বলব না, অন্যায় যে করবে আমরা সবাই তার বিরুদ্ধে দাঁড়াব। কে অন্যায় করল তার চেহারা দেখব না, সে কোন্ ধর্মের কোন্ বর্ণের কোন্ দলের তা দেখব না। কেবল বৌদ্ধরা মুসলিমদের মারলে বিক্ষুব্ধ হব, কিন্তু মুসলিমরা হিন্দুদের বাড়িঘর-মন্দির ধ্বংস করলে চুপ করে থাকব- এটা হবে আরেক অন্যায়। বৌদ্ধরা করুক, হিন্দুরা করুক, মুসলমানরা করুক, আমরা থাকব অন্যায়ের বিরুদ্ধে সোচ্চার। ১৬০ কোটি মুসলমান যদি যাবতীয় অন্যায়ের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হতে পারি তবে পৃথিবীর যে কোনো প্রান্তে যে কোনো জনগোষ্ঠীর অধিকার হরণের পূর্বে কোনো যালেম শক্তিকে একশ'বার ভাবতে হবে।

মহানবী (স.) এর আবির্ভাব
প্রকৃত ইসলাম কী পরিবর্তন এনেছিল আরবদের?

মোহাম্মদ আসাদ আলী

আজ থেকে ১৪০০ বছর আগে আল্লাহর রসুল যখন পৃথিবীতে ইসলাম প্রচার শুরু করলেন তখনকার আরব সমাজ এতটাই অন্যায়, অবিচার, হানাহানি, খুনোখুনি, রক্তপাত, বর্বরতা, ধর্মান্ধতা ও কুসংস্কারে নিমজ্জিত ছিল যে, ঐ সমাজকে বলা হয় আইয়ামে জাহেলিয়াত, অজ্ঞানতার যুগ, অন্ধকারের যুগ। ন্যূনতম সামরিক শক্তি, অর্থনৈতিক স্বচ্ছলতা, রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা, নৈতিকতাবোধ, সামাজিক ও পারিবারিক বন্ধন, জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা, মানবিক উৎকর্ষতা, পারস্পরিক ভ্রাতৃত্ব, ঐক্যচেতনা ইত্যাদি কিছুই তাদের ছিল না। শুধু ছিল বংশানুক্রমিক গৃহযুদ্ধ, গোত্রে গোত্রে হানাহানি, রক্তারক্তি, শত্রুতা, সীমাহীন অজ্ঞানতা, কুসংস্কার, কাঠ-পাথরের মূর্তিকেন্দ্রিক চিন্তার স্থবিরতা, ধর্মবাণিজ্য, জেনা-ব্যাভিচার, চুরি, ডাকাতি, লুটতরাজ, হুজুগপ্রবণতা, মাদকাসক্তি, দাসপ্রথা, কন্যাশিশু হত্যা, নারী নির্যাতন ইত্যাদি। অর্থাৎ ভালোর মধ্যে কিছু না থাকলেও খারাপের মধ্যে কিছুই বাদ ছিল না তাদের। পৃথিবীর সবচেয়ে পশ্চাদপদ জনগোষ্ঠী ছিল ঐ আরবরা। সেই আরবদের মধ্যে যখন ইসলামের আবির্ভাব ঘটল মাত্র কয়েক বছরের মধ্যে ইতিহাসের গতিপথই পরিবর্তিত হয়ে গেল। ঐ আরবদের মাধ্যমেই এমন যুগান্তকারী সভ্যতার উন্মেষ ঘটল যার সম্মুখে সমসাময়িক সকল আদর্শ, সকল মতবাদ, সকল সভ্যতা আবেদন হারিয়ে বর্ণহীন হয়ে গেল। সম্ভাবনাহীন একটি উপাদান বা শূন্য (পি. কে হিট্টির ভাষায়) থেকে জন্ম হলো বিরাট এক বটবৃক্ষের। সেই বৃক্ষের ছায়াতলে আসলো অর্ধ দুনিয়া। আসুন জেনে নেয়া যাক- প্রকৃত ইসলাম আরবদের মধ্যে কী পরিবর্তন সাধন করেছিল।

১। ইসলাম অনৈক্য-হানাহানিতে লিপ্ত দাঙ্গাবাজ আরবদেরকে ইস্পাতকঠিন ঐক্যবদ্ধ ও সুশৃঙ্খল জাতিতে পরিণত করেছিল। বংশানুক্রমিক শত্রুতা আর রক্তপাতে নিমজ্জিত আরব জাতির প্রত্যেক সদস্যকে একে অপরের ভাই বানিয়ে দিয়েছিল।

৩। আরব-অনারব, আশরাফ-আতরাফ, ধনী-দরিদ্র, শিক্ষিত-নিরক্ষরের আকাশ-পাতাল মর্যাদার ব্যবধান দূর করেছিল ইসলাম। মর্যাদার একমাত্র মানদণ্ড নির্ধারিত হয়- তাকওয়া অর্থাৎ ন্যায়ের পক্ষে থেকে অন্যায়ের বিরুদ্ধে সোচ্চার থাকা। যিনি যত ন্যায়ের পক্ষাবলম্বনকারী তিনি ছিলেন তত মর্যাদাবান।

৪। যে সমাজে দাসদেরকে মানুষ মনে করা হতো না, সেই সমাজের ক্রীতদাস বেলালকে (রা.) কাবা'র উর্ধ্বে উঠিয়ে (মক্কা বিজয়ের পর) আল্লাহর রসুল (স.) বুঝিয়ে দিলেন- সবার উর্ধ্বে মানুষ, সবার উপরে মানবতার স্থান। আল্লাহর কাছে একজন সত্যনিষ্ঠ মানুষের মূল্য তাঁর ক্বাবার চেয়েও অধিক। কৃতদাস যায়েদ ও তার পুত্র উসামাকে সেনাপ্রধান বানিয়ে রসুল প্রমাণ করলেন- যোগ্যতা ও তাকওয়ায় যে শ্রেষ্ঠ সেই প্রকৃত শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী। বংশ-আভিজাত্যের শ্রেষ্ঠত্ব প্রকৃত শ্রেষ্ঠত্ব নয়। এই সাম্যবাদী আদর্শ লাখ লাখ বেলাল, যায়েদদের অন্তরে মুক্তির তুফান সৃষ্টি করেছিল তা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

৪। সাম্প্রদায়িক ও গোত্রগত বিভাজন আরব সমাজের পশ্চাদপদতার অন্যতম কারণ ছিল। ইসলাম এই বিভাজন দূর করে সকল ধর্ম-বর্ণ-গোত্র-বংশের মানুষকে আল্লাহর তওহীদের ভিত্তিতে ন্যায় ও সত্যের পক্ষে ঐক্যবদ্ধ করেছিল। কে কোন ধর্মের, কে কোন বর্ণের, কে কোন গোত্রের- তা বিবেচ্য বিষয় ছিল না, যারাই ন্যায় ও সত্যের পক্ষে অবস্থান নিয়েছে ইসলাম তাদেরকেই আলিঙ্গন করে নিয়েছে। ইসলামের এই সার্বজনীনতার কাছে অন্য সব আদর্শ ম্রীয়মান হয়ে পড়ে।

৫। নির্যাতিত-নিপীড়িত, শোষিত মানুষ, যারা বেঁচে থাকত গোত্রপতি, সমাজপতি ও যাজক-পুরোহিতদের কৃপাগুণে, যাদের কোনো অধিকার ছিল না, সম্মান ছিল না, যাদের মাথাকাটা যাবার জন্য সমাজপতিদের একটি সিদ্ধান্তই যথেষ্ট ছিল, ইসলাম তাদের অধিকার ফিরিয়ে দিয়েছিল। ওই দাসশ্রেণির মানুষই এক সময় তাদের 'আমিরুল মু'মিনিনের' গায়ের জামা কীভাবে বানানো হলো তার কৈফিয়ত জানতে চেয়েছে, জনসম্মুখে কৈফিয়ত দিতে হয়েছে অর্ধ-পৃথিবীর শাসককে। শুধু ওই সময়ের পৃথিবীতেই নয়, এমন দৃষ্টান্ত আজকের যুগেও কেউ স্থাপন করতে পারে না।

৬। ইসলাম ক্ষুধার্তকে খাদ্য দিয়েছে, বাস্তুহারাকে

বাস্তু দিয়েছে। কে কোথায় কী সমস্যায় পড়ে আছে তার সমাধান করার জন্য রাতের আঁধারে রাস্তাঘাটে, অলি-গলিতে ঘুরে বেড়িয়েছেন ইসলামের খলিফা, অর্ধপৃথিবীর শাসনকর্তা।

৭। ইসলাম এমন স্বচ্ছ শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করে যে, অর্ধপৃথিবীর শাসনকর্তা একটি খেজুরপাতার ছাউনি দেয়া মসজিদে বসে রাজ্য শাসন করত। যার আবার একটির বেশি জামা ছিল না। যে ব্যক্তি তটস্থ থাকত তার শাসনের অধীনে কেউ কোথাও কষ্ট পাচ্ছে কিনা, একটি কুকুরও না খেয়ে থাকছে কিনা সেই দুশ্চিন্তায়। ঘুম এলে গাছের নিচে ঘুমিয়ে পড়তেন। যার যখন ইচ্ছা খলিফার সাথে দেখা করত, সমস্যা বলত, সমাধান হয়ে যেত।

মূল কথা হচ্ছে ইসলাম মানুষের বাস্তব সমস্যার বাস্তব সমাধান করতে পেরেছিল। যখন মানুষের সমস্যা ছিল অধিকারহীনতা, অন্যায়, অবিচার, নির্যাতন, স্বাধীনতাহরণ, শোষণ, বঞ্চনা, দারিদ্র্য; তখন ইসলাম মানুষকে মুক্তির সন্ধান দিতে এগিয়ে এসেছিল। প্রতিষ্ঠা করেছিল ন্যায়, শান্তি, সুবিচার ও নিরাপত্তা। এতে সন্দেহের অবকাশ নেই যে, ওই ন্যায় ও শান্তি দেখেই পৃথিবীর কোটি কোটি মানুষ ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিল।

প্রকৃত ইসলামের সেই প্রাঞ্জল আদর্শ আজ নেই। তাই এককালে যে মুসলিমরা অর্ধদুনিয়াকে ন্যায়, শান্তি ও সুবিচারের অলঙ্কারে সাজিয়ে তুলেছিল সেই মুসলিমরাই আজ সারা পৃথিবীতে সবচেয়ে অবজ্ঞাত, উপেক্ষিত, নির্যাতিত ও অপমানিত জনগোষ্ঠীতে পরিণত হয়েছে। আমরা যেন পুনরায় আল্লাহর রসুলের আনীত প্রকৃত ইসলামের সেই হারিয়ে যাওয়া আদর্শকে ধারণ করতে পারি, তবেই আমরা নিজেদেরকে বিশ্বনবীর প্রকৃত উম্মাহ বলে বিশ্বাস ও দাবি করতে পারি।

মুসলিম জাতির সঙ্কট ও পরিত্রাণের পথ

রাকীব আল হাসান

বর্তমান বিশ্বে মুসলিম জাতির সবচেয়ে বড় সঙ্কট কোনটি, এমন প্রশ্নের উত্তরে হয়ত একেকজন একেকটা বিষয় উল্লেখ করবেন। কেউ বলবেন অনৈক্য, নিজেদের মধ্যে হানাহানি, কেউ বলবেন অশিক্ষা, কুশিক্ষা, দারিদ্র্য, কুসংস্কার আবার কেউ হয়ত বলবেন অন্যান্য জাতির দ্বারা নির্যাতিত, অপমানিত, লাঞ্ছিত, নিপীড়িত হবার কথা। আবার মুসলমানদের সঙ্কট নিয়ে কয়জন চিন্তা করেন তাও সন্দেহের বিষয়। কিন্তু মুসলিম হিসাবে আমাদেরকে অবশ্যই ভাবতে হবে এ জাতির সঙ্কট নিয়ে এবং এ থেকে পরিত্রাণের পথ নিয়ে।

যখন রোহিঙ্গা মুসলিমদের উপর বৌদ্ধরা অত্যাচার চালায়, ফিলিস্তিনি মুসলিমদের উপর ইহুদিরা বর্বরোচিত হামলা চালায়, কাশ্মিরের মুসলিমদের উপর হিন্দুরা পাশবিক নির্যাতন চালায়, বসনিয়ার মুসলিমদের উপর খ্রিষ্টানরা নিষ্ঠুরভাবে নিপীড়ন চালায় তখন তার প্রতিবাদে জুমার দিনে এখানে ওখানে বৌদ্ধ, হিন্দু, খ্রিষ্টান, ইহুদিদের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ হয়, নিজেদের দেশের আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর সাথে সংঘাত হয়। নিজেদের দেশের বিভিন্ন স্থাপনা ধ্বংস করা হয়, মনের জ্বাল মেটাতে বিভিন্ন জায়গায় অগ্নিসংযোগ করা হয় ভাঙচুর করা হয়। কোনো নিপীড়িত মানুষের নিপীড়ন দেখে বিক্ষুব্ধ হওয়া স্বাভাবিক কিন্তু এ সমস্যার সমাধান কীভাবে হবে তা নিয়ে চিন্তা না করে কেবল প্রতিবাদ করে কোনো লাভ আজ পর্যন্ত হয় নি, কারণ আমাদের এই নিষ্ফল প্রতিবাদে কোনো জনগোষ্ঠীই আজ পর্যন্ত রক্ষা পায় নি। তাছাড়া মুসলিমদের এই অবস্থার, এই পরিণতির জন্য সবচেয়ে আগে যে বিষয়টি দায়ী সেটা হলো আদর্শচ্যুতি, লক্ষ্যচ্যুতি। যার পরিণামে তারা নিজেদের মধ্যেই আজ অনৈক্য, দ্বন্দ্ব সংঘাতে লিপ্ত। মধ্যপ্রাচ্যে আজকের ভয়াবহ যে সঙ্কট সেটা নিজেরা নিজেরা ভ্রাতৃঘাতী সংঘাত শিয়া-সুন্নী দ্বন্দ্ব, সে ব্যাপারে কিন্তু কেউ বলছেন না। মহানবী (সা.) বলেছেন ইহুদিরা ৭২ ফেরকায় বিভক্ত হয়েছে আর আমার উম্মাহ ৭৩ ফেরকায় বিভক্ত হবে। অনেক আলেম ৭৩ ফেরকা বলতে অসংখ্য ভাগে ভাগ হয়ে যাওয়ার কথা ব্যাখ্যা করেছেন। এখন মুসলিম জাতির সেই

পরিণতিই হয়েছে। আমরা হাজারো ভাগে বিভক্ত। নিজেরাই নিজেদের শত্রুতে পরিণত হয়েছি।

কেন আমাদের এই পরিণতি হলো?

মহানবী মোহাম্মদ (সা.) যখন আইয়্যামে জাহেলিয়াতের অন্ধকার সমাজে আসলেন তখন সেই সমাজের মানুষগুলো অনৈক্য, হানাহানি, যুদ্ধ, রক্তপাতে নিমজ্জিত ছিল। দুর্বলের কোনো অধিকার ছিল না, মানুষের উপর জোরপূর্বক দাসত্ব চাপিয়ে দেওয়া হতো। দরিদ্রের উপর ছিল অর্থনীতিক চূড়ান্ত অবিচার। নারীদের কোনো সম্মান ছিল না, কন্যাশিশুকে জীবন্ত কবর দেওয়া হতো। এক কথায় সকল দিক দিয়ে তারা ছিল চরম অন্যায়, অবিচার আর অশান্তির মধ্যে নিমজ্জিত। সেই সমাজের মানুষকে রসুলাল্লাহ (সা.) সীসাঢালা প্রাচীরের ন্যায় ঐক্যবদ্ধ একটা জাতিতে পরিণত করলেন। সত্য, ন্যায়, সুবিচার, সাম্য, নিরাপত্তা, ন্যায্য অধিকার এক কথায় চূড়ান্ত শান্তি প্রতিষ্ঠিত হলো সেই সমাজে। সেই জাতি গঠন, সেই সমাজ প্রতিষ্ঠা, সেই সভ্যতা নির্মাণের ভিত্তি ছিল কলেমা- "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রসুলাল্লাহ" অর্থাৎ "আল্লাহ ছাড়া কারো হুকুম মানব না, মুহাম্মদ (সা.) আল্লাহর রসুল"। আল্লাহর হুকুম মানে হলো- চূড়ান্ত ন্যায়। অর্থাৎ ন্যায়ের ভিত্তিতে রসুল (সা.) উম্মতে মোহাম্মদী নামক একটি জাতি গঠন করলেন যারা রসুলাল্লাহ (সা.) এর ইন্তেকালের পর আরবভূমি থেকে পৃথিবীর বুকে ছড়িয়ে পড়লেন সেই ন্যায়ভিত্তিক, কলেমা ভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠার জন্য। অর্ধ-পৃথিবীতে সত্য, ন্যায়, সুবিচার ও শান্তি প্রতিষ্ঠিত হলো। মুসলিম জাতি হলো শ্রেষ্ঠ জাতি, শিক্ষকের জাতি, সবচেয়ে উন্নত জাতি ও তখনকার সময়ের সর্বাধুনিক সভ্যতার নির্মাতা। অন্যান্য সকল জাতি তাদের দিকে সভয় সম্ভ্রমে তাকিয়ে থাকত। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক ব্যাপার হলো- এ জাতির পরবর্তী সুলতানগণ ভোগ-বিলাসিতায় মত্ত হলো। তারা আর ইসলামের খলিফা থাকল না, তারা হয়ে গেল রাজা-বাদশাহ, কিসরা, কায়সার। ক্ষমতার লোভ তাদের পেয়ে বসল, রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করে ফেলল, ন্যায়ের দণ্ড ছেড়ে স্বার্থের দণ্ড ধারণ করল। ন্যায়ের দণ্ড ছাড়ার অর্থই হলো- কলেমা থেকে বিচ্যুত হয়ে যাওয়া। ভিত্তিই যখন নষ্ট হয়ে গেল তখন তাদের মধ্যে নানা রকম অনৈক্য, বিভেদ জন্ম নিল। নিজেদের মধ্যে শুরু হলো ক্ষমতার দ্বন্দ্ব। সময়ের ব্যবধানে এক মুসলিম উম্মাহ ভেঙ্গে শিয়া-সুন্নী, শাফেয়ী, মালেকী, হানাফী, হাম্বলী, মুজাদ্দেদিয়া, নক্সবন্দীয়, আলিয়া, খারেজি এক কথায় হাজারো ভাগে বিভক্ত হয়ে গেল। এটা স্বাভাবিক যে, বিভক্তি মানেই হলো দুর্বল হয়ে যাওয়া। এই জাতিও নিজেরা নিজেরা দ্বন্দ্ব, সংঘাত, হানাহানি করতে করতে দুর্বল হয়ে গেল। এক সময় এই সুযোগটাই নিল অন্য জাতিগুলো। আস্তে আস্তে পৃথিবীর প্রায় সকল জাতিই এই মুসলিম জাতির উপর নানামুখী নির্যাতন, অত্যাচার করার সুযোগ ও সাহস পেল। আজকে পৃথিবীব্যাপী মুসলিমদের যে করুণ পরিণতি তার মূল কারণ এটাই। বর্তমানে মুসলিম জাতির সবচেয়ে বড় সঙ্কটও নিজেদের মধ্যে নানামুখী অনৈক্য, বিভেদ, হানাহানি এবং এর ফলে পৃথিবীব্যাপী এই জাতির উপর চলছে নির্যাতন, নিপীড়ন, লাঞ্ছনা, অপমান।

এখন করণীয়:

আমরা ইতিহাস থেকে বুঝতে পারলাম বর্তমানের এই সঙ্কট সৃষ্টির পেছনে প্রধানত আমরা অর্থাৎ মুসলিমরা নিজেরাই দায়ী। কাজেই এই সঙ্কট থেকে পরিত্রাণের জন্য আমাদেরকে এখন ভাবতে হবে। আমাদেরকে বুঝতে হবে দুর্বলের উপর অন্যায়কারীরা অত্যাচার চালাবেই, আর একটা জাতি দুর্বল হয় অনৈক্য থেকে। মহান আল্লাহ পবিত্র কোর'আনে বলেছেন, আর তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের আনুগত্য করো। তোমরা পরস্পরে ঝগড়া করো না, তাহলে তোমরা সাহস হারিয়ে ফেলবে এবং তোমাদের প্রভাব প্রতিপত্তি দূর হয়ে যাবে (সুরা আনফাল ৪৬)।

মুসলিম জাতিও চরম দুর্বল হয়েছে তাদের মধ্যকার বিভেদ, বিভাজনের কারণে। জনশক্তি, খনিজ সম্পদ, বিরাট ভূখণ্ড, অসংখ্য সমুদ্র বন্দর, সমুদ্র পথ, পণ্ডিত, আলেম-ওলামা, লেখক-সাহিত্যিক, ডাক্তার-ইঞ্জিনিয়ার ইত্যাদি কোনো কিছুর অভাব নেই এই মুসলিম জাতির, কেবল এক শক্তিশালী আদর্শের অভাব যার ভিত্তি হলো তওহীদ। এই জাতির মধ্যে ঐক্য না থাকার কারণে পৃথিবীর নানা প্রান্তে তারা নির্যাতিত হচ্ছে। এখন মুসলিম জাতির সর্বপ্রথম কর্তব্য হলো তুচ্ছাতিতুচ্ছ বিষয়গুলোকে পেছনে রেখে আগে ঐক্যবদ্ধ হওয়া। রসুলাল্লাহ (সা.) যেমন কলেমা তওহীদের উপর অর্থাৎ আল্লাহর হুকুম তথা যাবতীয় ন্যায়ের উপর ভিত্তি করে একটি জাতি গঠন করলেন এবং ন্যায়ভিত্তিক একটি সমাজ গড়ে তুললেন সেভাবে এক আল্লাহর হুকুমের উপর মুসলিমদেরকে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। জাতি যখন ঐক্যবদ্ধ হবে তখন তারা হবে বিরাট শক্তি। অন্যান্য জাতিগুলো তখন এমনিতেই অত্যাচার বন্ধ করে দিবে।

আকিদা-ঈমান-আমল

রাকীব আল হাসান

লক্ষ-কোটি টাকা খরচ করে আলিশান মসজিদ হচ্ছে। টাইলসের মসজিদ, শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত মসজিদ, সোনার গম্বুজ ওয়ালা মসজিদ বিভিন্ন রকম মসজিদ হচ্ছে যেন সবাই শান্তিতে নামাজ পড়তে পারে। সহি-শুদ্ধভাবে কোর'আন শিক্ষা হচ্ছে, নামাজের নিয়ম-কানুন শিক্ষা হচ্ছে, মানুষ মাদ্রাসা-মক্তবে যাচ্ছে যেন শুদ্ধভাবে নামাজ পড়তে পারা যায়। লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করে মানুষ হজ্বে যাচ্ছে, কোরবানি দিচ্ছে, যাকাত দিচ্ছে, রমজান মাসে রোজা রাখছে এমনকি অনেকে সারা বছর নফল রোজাও রাখছে, সারারাত জেগে নফল নামাজ পড়ছে অর্থাৎ আমল করা হচ্ছে। আমল যেন নির্ভুল হয় সেজন্য আমরা সদা তৎপর কিন্তু সমস্ত আমলই অর্থহীন, ব্যর্থ হয়ে যাবে যেটা না থাকলে সেটার ব্যাপারে আমরা কতটা সচেতন?

যে কোনো আমলের পূর্বশর্ত হচ্ছে ঈমান। ঈমান ছাড়া আমল অর্থহীন। এখন এই ঈমান কী? ঈমান হলো- "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মোহাম্মদুর রসুলাল্লাহ (সা.), আল্লাহ ছাড়া কোনো হুকুমদাতা নেই এবং মোহাম্মদ (সা.) আল্লাহর রসুল" এই কলেমাতে স্বীকৃতি দেওয়া। অর্থাৎ ব্যক্তিজীবন থেকে শুরু করে জাতীয়, আন্তর্জাতিক এক কথায় জীবনের সর্ব অঙ্গনে আল্লাহর হুকুম তথা যাবতীয় ন্যায়কে মেনে নেওয়ার স্বীকৃতিই হচ্ছে ঈমান। সহজ কথায় যাবতীয় অন্যায়ের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়ে ন্যায় স্থাপনার জন্য দৃঢ়প্রত্যয়ী হওয়া। স্বীকৃতির পরবর্তী কাজ হলো আল্লাহর রাস্তায় জীবন ও সম্পদ দিয়ে যাবতীয় অন্যায় দূর করে ন্যায় প্রতিষ্ঠার জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়ে যাওয়া। এটিই হলো সর্বপ্রথম এবং প্রধান আমল। এটি ছাড়া মো'মেন হওয়া যায় না। (সুরা হুজরাত-১৫)। যখন মানুষ তার জীবনে আল্লাহর আদেশ-নিষেধকে প্রত্যাখ্যান করেছে তখন সমাজ থেকে সকল প্রকার অন্যায় অবিচার দূর করে শান্তি প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম বাদ দিয়ে যত আমলই করা হোক তা নিরর্থক হবে।

কিন্তু আজ আমাদের এই আমল নিরর্থক হচ্ছে কি না ভাবতে হবে। আমরা আল্লাহ, নবী-রসুল, আসমানী কিতাব, আখেরাত, জান্নাত-জাহান্নাম, তকদীর ইত্যাদিতে বিশ্বাস করি কিন্তু ঈমান এই বিশ্বাসটুকুর মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। এই বিশ্বাসের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে জীবনের সর্বক্ষেত্রে আল্লাহর হুকুম তথা ন্যায়, সত্য ধারণ করা এবং জীবন-সম্পদ দিয়ে সকল প্রকার অন্যায়-অসত্যের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধভাবে সংগ্রাম করাই হচ্ছে প্রকৃত আমল। আজ আমরা নামাজ-রোজাসহ অনেক আমল করছি কিন্তু যে যার ক্ষেত্রে স্বার্থপর, ভোগবাদী পশ্চিমা বস্তুতান্ত্রিক আত্মাহীন দাজ্জালীয় সভ্যতার দর্শনে দীক্ষিত। ন্যায়ের বদলে অন্যায়কে ধারণ করেছি। আল্লাহর হুকুম তথা কলেমার মর্মবাণী প্রত্যাখ্যান করে কেবল মুখে কলেমার বাণী উচ্চারণ করে মো'মেন থাকা যায় না। মুখে মুসলিম দাবিদার হয়ে অন্যায়, অবিচার, প্রতারণা, বিশ্বাসঘাতকতা, স্বার্থপরতার জীবন দর্শন ধারণ করে সত্যিকার অর্থে মুসলিম থাকা যায় না।

কিন্তু আমরা একটা দৃশ্য সর্বত্র দেখতে পাই, শহর-গ্রাম, পাড়া-মহল্লাসহ সব জায়গাতেই মানুষ টুপি-পাঞ্জাবী পরে টাখনুর উপর পাজামা তুলে মসজিদে নামাজ পড়তে যাচ্ছে, কোরবানি করছে, হজ করে আসছে, ওয়াজ-মাহফিল শুনছে, কোর'আন তেলাওয়াত করছে, যিকির-আসগর করছে। অর্থাৎ আমরা বুঝাতে চাইছি আমরা পাক্কা মুসলমান। কিন্তু কিভাবে? এই যে আমল করে যাচ্ছি আমাদেরকে কে বলে দেবে সমাজে যখন চূড়ান্ত অন্যায় চলে, চরম অশান্তি চলে, মানুষগুলো ত্রাহী সুরে চিৎকার করে বাঁচার জন্য তখন তাদের জন্য ন্যায়পূর্ণ, শান্তিপূর্ণ সমাজ বিনির্মাণের চেষ্টা না করে পাহাড় সমান আমল করলেও তা আল্লাহর নিকট গ্রহণযোগ্য হবে না। কাজেই আগে আল্লাহর কলেমা, তওহীদ অর্থাৎ আল্লাহর সার্বভৌমত্বের স্বীকৃতি দিয়ে (ন্যায় ও সত্যের পক্ষে দাঁড়িয়ে) মো'মেন হওয়া জরুরি। তারপরে যত পারা যায় ঐসব আমল।

আরেকটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো- ঈমানের পূর্বশর্ত হচ্ছে আকিদা। এ বিষয়ে সমস্ত আলেম ও ফকিহগণ একমত যে, আকিদা সঠিক না হলে ঈমানের কোনো মূল্য নেই। যে জিনিসটি সঠিক না হলে ঈমানের কোনো মূল্য নেই- সেই জিনিসটি অবশ্যই অতি গুরুত্বপূর্ণ, কারণ নামাজ, রোজা, হজ, যাকাতসহ সকল ইবাদতের মূল হচ্ছে ঈমান। কিসের ওপর ঈমান? আল্লাহর, তাঁর রসুলদের, মালায়েকদের, হাশরের দিনের বিচারের, জান্নাত, জাহান্নাম, তকদীর ইত্যাদির ওপর ঈমান। এই ঈমান অর্থহীন হয়ে গেলে স্বভাবতঃই এই নামাজ, রোজা, হজ, যাকাত এবং অন্যান্য সমস্ত রকমের ইবাদতও অর্থহীন। যে জিনিস সঠিক না হলে ঈমান এবং ঈমান ভিত্তিক সমস্ত আমল অর্থহীন সেই মহাগুরুত্বপূর্ণ আকিদা কী?

আকিদা হচ্ছে কোনো জিনিস বা ব্যাপার সম্বন্ধে সঠিক ও সম্যক ধারণা অর্থাৎ Comprehensive concept। কোনো জিনিস বা ব্যাপার, তা যে কোনো জিনিস হোক না কেন, সেটা দিয়ে কি হয়, সেটার উদ্দেশ্য কী সে সম্বন্ধে সম্যক ধারণা বা Comprehensive concept হচ্ছে আকিদা। যে কোনো জিনিস বা ব্যাপার সম্বন্ধে এই ধারণা পূর্ণ ও সঠিক না হলে সেই জিনিসটি অর্থহীন। আল্লাহ তাঁর রসুলদের (আ.) মাধ্যমে মানবজাতিকে দীন অর্থাৎ জীবন-ব্যবস্থা দিয়েছেন। তিনি কি কোনো উদ্দেশ্য ছাড়াই এই দীন দিয়েছেন? অবশ্যই নয়। নিশ্চয়ই কোনো উদ্দেশ্য আছে। যদি আমরা সেই উদ্দেশ্য না বুঝি বা যদি সেই উদ্দেশ্য সম্বন্ধে ভুল ধারণা করি, তবে ঐ দীন অর্থহীন হয়ে যাবে। এ জন্যই ফকিহরা, ইমামরা সকলেই একমত যে আকিদা অর্থাৎ উদ্দেশ্য সম্বন্ধে ধারণা সঠিক না হলে ঈমান ও সমস্ত ইবাদত নিষ্ফল।

একটি উদাহরণ দিচ্ছি। কেউ আপনাকে একটি মটর গাড়ি উপহার দিলেন। মনে করুন এই মটর গাড়িটি ইসলাম- আল্লাহ মানব জাতিকে যা উপহার দিয়েছেন।

যিনি গাড়িটি উপহার দিলেন তিনি ঐ সঙ্গে গাড়িটির রক্ষণাবেক্ষণ কেমন করে করতে হবে সেই নিয়মাবলীর একটি বইও দিলেন, যাকে বলা হয় Maintenance Book। মনে করুন এই বই কোর'আন ও সহীহ হাদিস। গাড়ির উদ্দেশ্য কী? উদ্দেশ্য হচ্ছে ওটাতে চড়ে বিভিন্ন জায়গায় যাওয়া। এটাই হচ্ছে গাড়িটির আসল উদ্দেশ্য। ওটাকে তৈরিই করা হয়েছে ঐ উদ্দেশ্যে। কিন্তু ঐ সঙ্গে আরামে বসার জন্য তার ভেতরে গদীর আসন তৈরি করা হয়েছে, খবর, সঙ্গীত শোনার জন্য রেডিও, ডিভিডি প্লেয়ার লাগনো হয়েছে, গাড়িটিকে সুন্দর দেখাবার জন্য চকচকে রং করা হয়েছে। গাড়িটির সঙ্গে যে Maintenance বই আপনাকে দেয়া হয়েছে তাতে বলা আছে গাড়িটিতে কোন্ ধরনের পেট্রোল দিতে হবে, কত নম্বর মবিল দিতে হবে। কোথায় কোথায় চর্বি (Grease) দিতে হবে ইত্যাদি। শুধু তাই নয় দেখতেও যেন গাড়িটি সুন্দর হয় সেজন্য কোথাও রং খারাপ হয়ে গেলে কেমন রং কেমনভাবে লাগালে গাড়ি সুন্দর দেখাবে তাও সব কিছু আছে। ঐ Maintenance বইয়ে এত সব কিছু লেখা থাকলেও মূল সত্য হচ্ছে এই যে ঐ গাড়ি তৈরির উদ্দেশ্য হচ্ছে ওটা আপনাকে আপনার প্রয়োজনীয় গন্তব্যস্থানে নিয়ে যাবে। বাকি সব ঐ উদ্দেশ্যের পরিপূরক। এখন আপনি যদি না জানেন ঐ গাড়িটি দিয়ে কী হয়, ওটাকে কী উদ্দেশ্যে তৈরি করা হয়েছে তবে আপনাকে ঐ গাড়িটি উপহার দেয়া নিষ্ফল, অর্থহীন। ঐ গাড়িটির উদ্দেশ্য আপনাকে প্রয়োজন মোতাবেক ঢাকা, চট্টগ্রাম, সিলেট, রংপুর নিয়ে যাওয়া। আপনি যদি সেটাই না বোঝেন তবে আপনি কী করবেন? আরামের গদি দেখে ভাববেন এই গাড়িটিকে তৈরি করার উদ্দেশ্য হচ্ছে এই গদিতে বসে আরাম করা। কিংবা ভাববেন এটা তৈরির উদ্দেশ্য হচ্ছে রেডিও শোনা, সঙ্গীত শোনা। আর তাই মনে করে আপনি গাড়িটির আরামের সিটে বসে রেডিও, ডিভিডি বাজাবেন।

এই হলে আপনার আকিদার ভুল হলো। আপনাকে গাড়িটি উপহার দেয়া অর্থহীন হলো কারণ ওটার আসল উদ্দেশ্যই আপনি বুঝলেন না। আপনি যদি গাড়ির Maintenance বই দেখে দেখে অতি সতর্কতার সাথে যথাস্থানে চর্বি লাগান, মবিল দেন, চাকায় পাম্প দেন, গাড়ির ট্যাংকে তেল দেন, গাড়ির রং পালিশ করেন, তবুও সবই অর্থহীন যদি আপনি না জানেন যে গাড়িটির আসল উদ্দেশ্য কী? অর্থহীনতা ছাড়াও আরও একটি ব্যাপার হবে। সেটা হলো আপনার অগ্রাধিকারের (Priority) ধারণাও ভুল হয়ে যাবে। তখন আপনার কাছে গাড়ির ইঞ্জিনের চেয়েও প্রয়োজনীয় ব্যাপার হয়ে দাঁড়াবে গাড়ির রেডিও, ডিভিডি প্লেয়ার, গাড়ির রং ইত্যাদি। অর্থাৎ অগ্রাধিকার ওলট-পালট হয়ে গিয়ে অতি প্রয়োজনীয় ব্যাপার হয়ে যাবে অতি সামান্য বা একেবারে বাদ যাবে আর অপ্রয়োজনীয় ব্যাপার হয়ে দাঁড়াবে মহা প্রয়োজনীয়। এ জন্যই সমস্ত আলেম, ফকিহ, ইমামরা একমত হয়েই বলেছেন যে, আকিদা অর্থাৎ কোনো ব্যাপার বা জিনিস সম্বন্ধে পূর্ণ ধারণা না হলে বা ওটার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে ভুল ধারণা হলে সম্পূর্ণ জিনিসটাই অর্থহীন- ঈমান এবং ঈমান ভিত্তিক অন্যান্য আমলও অর্থহীন।

আল্লাহ আমাদের ইসলাম বলে যে দীন, জীবন-বিধান দিয়েছেন সেটার উদ্দেশ্য কী, সেই আকিদা আমাদের বহু পূর্বেই বিকৃত হয়ে ঐ গাড়ির মালিকের মতো হয়ে গেছে- যে গাড়ির উদ্দেশ্যই জানে না। ঐ মালিকের মতো আমরা Maintenance বই, অর্থাৎ কোর'আন-হাদিস দেখে দেখে অতি সতর্কতার সাথে গাড়ির পরিচর্যা করছি- কিন্তু ওটাতে চড়ি না, ওটা চালিয়ে আমাদের প্রয়োজনীয় গন্তব্যস্থানে যাই না, গ্যারেজে রেখে দিয়েছি- কারণ ওটার আসল উদ্দেশ্যই আমরা জানি না বা যেটা মনে করি তা ভুল বা বিকৃত। কাজেই আমাদের অগ্রাধিকারও (Priority) ওলট-পালট হয়ে গেছে। প্রকৃত উদ্দেশ্যই অর্থাৎ তওহীদ ও তা প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম আমরা ত্যাগ করেছি, কিন্তু গাড়ির রং, পালিশ, অর্থাৎ দাড়ি, টুপি, পাগড়ী, আলখাল্লা সম্বন্ধে আমরা অতি সতর্ক। আকিদার বিকৃতি ও তার ফলে অগ্রাধিকারের ওলট-পালটের পরিণাম এই হয়েছে যে, আল্লাহ আমাদের ত্যাগ করেছেন, আমরা তাঁর গযবের ও লানতের পাত্রে পরিণত হয়েছি।

আকিদার ভুলের কারণে ইসলামের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় জেহাদকে আজ সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠায় ব্যবহারের পরিবর্তে জঙ্গিবাদ সৃষ্টিতে ব্যবহার করা হচ্ছে। ইসলাম মানবজাতির যাবতীয় সমস্যা দূর করে ন্যায় ও শান্তিপূর্ণ একটা সমাজ উপহার দেওয়ার কথা ছিল কিন্তু আকিদা ভুল হওয়ার কারণে আজ ইসলামকে কেবল সওয়াব কামানোর মাধ্যম গণ্য হচ্ছে, কিছু রীতি-নীতি, আনুষ্ঠানিকতাকেই ইসলাম মনে করা হচ্ছে। আকিদা ভুল হওয়ার কারণে ইসলামের সঠিক ব্যবহার হচ্ছে না, ফলে আমরা আজ পৃথিবীর নিকৃষ্টতম জাতিতে পরিণত হয়েছি। অন্য সমস্ত জাতি, পৃথিবীর প্রায় সর্বত্র আমাদের গণহত্যা করছে, আমাদের বাড়ি-ঘর জ্বালিয়ে দিচ্ছে, আমাদের পর্দানশিন মা-বোনদের ধর্ষণ করছে, হাজারে হাজারে আমাদের মসজিদ ধ্বংস করে দিচ্ছে। আর নিজেদের মধ্যে পারস্পরিক হানাহানি, অবিশ্বাস, দ্বন্দ্ব, অনৈক্য, অশিক্ষা, কুসংস্কার ইত্যাদির মধ্যে ডুবে আছি অর্থাৎ অশান্তির মধ্যে আছি। অশান্তির মধ্যে আছি মানেই ইসলামে (ইসলাম শব্দের আক্ষরিক অর্থই শান্তি) নেই।

এখন এই লানত, শাস্তি থেকে পরিত্রাণের একটাই পথ, আল্লাহর দেওয়া জীবনব্যবস্থায় ফিরে যাওয়া। সেই প্রকৃত, অনাবিল, শান্তিদায়ক, নিখুঁত, ভারসাম্যপূর্ণ জীবনব্যবস্থা আল্লাহর প্রেরিত সর্বশেষ নবী মোহাম্মদ (সা.) এর মাধ্যমে আল্লাহ যেটা পাঠিয়েছিলেন সেটা কোথায় পাওয়া যাবে?

সেটা আল্লাহ হেযবুত তওহীদকে দান করেছেন। আজ সারা পৃথিবীতে আকিদা ভুলে যাওয়ার কারণে ইসলামকে যেভাবে চর্চা করা হচ্ছে, মসজিদ, মাদ্রাসা, মক্তবে, খানকায় যেভাবে ইসলাম শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে সেটা আল্লাহর দেওয়া প্রকৃত ইসলাম নয়। ফলে ১৬০ কোটির এই জনসংখ্যা শান্তিতে নেই, অন্য জাতির গোলামী করে যাচ্ছে। আমরা ইসলামের প্রকৃত আকিদা সমস্ত মানবজাতির সামনে তুলে ধরছি, এই আকিদা ফিরে পেলে আমরাই সমস্ত মানবজাতিকে পরিপূর্ণ শান্তি ও নিরাপত্তা দিতে পারব, সমস্ত মানবজাতিকে একটি পরিবারে পরিণত করতে পারব ইনশা'আল্লাহ।

প্রয়োজন আরেক রেনেসাঁ

হোসাইন মোহাম্মদ সেলিম

ধর্মীয় দর্শন ও বৈজ্ঞানিক সূত্র উভয় দিক থেকেই এটা স্বীকৃত যে অন্য সব প্রাণীর থেকে মানুষের অনেকগুলো মৌলিক তফাত রয়েছে, মানুষ একটি অসাধারণ সৃষ্টি। কোনো প্রাণীর প্রখর ঘ্রাণশক্তি আছে, কিন্তু তার সেরকম প্রখর দৃষ্টিশক্তি নেই। কোনো কোনো প্রাণীর দৃষ্টিশক্তি সাংঘাতিক কিন্তু ঘ্রাণশক্তি নেই বললেই চলে। কারো গায়ে অনেক শক্তি কিন্তু তার শ্রবণশক্তি ক্ষীণ। কিন্তু মানুষ হচ্ছে এমন এক সৃষ্টি যার মধ্যে সকল প্রাণীর বৈশিষ্ট্যগুলোর একটি সমন্বয় ঘটেছে। মানুষের সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য হচ্ছে তার মস্তিষ্ক। এই মস্তিষ্ক দিয়ে সে চিন্তা করে ন্যায়-অন্যায়, উচিত-অনুচিত, সত্য-মিথ্যা, ভালো-মন্দের পার্থক্য অনুধাবন করতে পারে। আরেকটি অসাধারণ, বিস্ময়কর সত্ত্বা মানুষের মধ্যে বিরাজ করে সেটা হচ্ছে তার আত্মা যাকে কেউ বলেন বিবেক, চিন্তাশক্তি, উপলব্ধি করার ক্ষমতা, দূরদৃষ্টি, মন ইত্যাদি। আল্লাহর ভাষায় এটাই হচ্ছে রূহাল্লাহ বা আল্লাহর আত্মা যার মধ্যে আল্লাহর যাবতীয় গুণাবলীর সঙ্গে স্বাধীন ইচ্ছাশক্তিও রয়েছে, যদিও তা অতি ক্ষুদ্র মাত্রায়। বস্তু হলে তা চোখে দেখা যায়, তার আয়তন ভর পরিমাপ করা যায়। কিন্তু যা অবস্তু যেমন কোনো সঙ্কট, সেটা কত বড় সঙ্কট, তার ভয়াবহতা কী তা মস্তিষ্ক দিয়ে বুঝতে হয়, আত্মা দিয়ে উপলব্ধি করতে হয়। যদি কারো সম্মানের ব্যাপার হয় তাহলে সেই সম্মানের মাহাত্ম্য, উচ্চতা উপলব্ধি করতে হয় হৃদয় দিয়ে। যে জাতির চিন্তার জগতে স্থবিরতা আসে তাদের মৃত্যু অবধারিত হয়ে যায়। কিন্তু সমাজের শিক্ষিত শ্রেণিটি আধুনিকতার অহংকারে এতটাই স্ফীত হয়ে আছে যে, তারা এই সভ্যতাকে এই সমাজকে প্রগতিশীল সমাজ বলে। কারণ এই সময়ে মানুষ এত প্রযুক্তিগত উন্নতি করেছে যা দেখে সে আত্মপ্রসাদ লাভ করছে যে আমরা বুঝি অনেক সভ্য হয়েছি। সে একশ-দেড়শ তলা সুউচ্চ ভবন বানাচ্ছে। কিন্তু সত্যিকার অর্থে বর্তমানের চেয়ে বেশি স্থবিরতা, এত আবদ্ধতা, এত সংকীর্ণতা মানব ইতিহাসে আগে কখনো হয়েছে কিনা সন্দেহ।

এটা মানুষকে উপলব্ধি করতে হবে, মানুষের সবচেয়ে বড় পরাজয় কখন ঘটে। যখন মানুষ অন্যায়ের প্রতিবাদ করে না, যখন দুর্বলের উপর সবলের অত্যাচার, দরিদ্রের উপর ধনীর বঞ্চনা, মজলুমের উপর জালেমের অত্যাচার মানুষের হৃদয়কে আন্দোলিত করে না তখন তারা কীভাবে সভ্যতা ও প্রগতির অহংকার করে? আজকে মানুষ সকল অন্যায়ের কাছে দুই হাত তুলে আত্মসমর্পণ করেছে। সে অন্যায়ের সামনে দাঁড়িয়ে গেছে, স্থবির হয়ে গেছে। সে তার চোখ, কান, মুখ সব বন্ধ করে ফেলেছে। মানুষ এখন মৃত। সে আর দশটা পশুর মতো কেবল জীবনধারণে ব্যস্ত।

আধুনিক এই সভ্যতার জন্ম হয়েছিল ইউরোপীয় রেনেসাঁর হাত ধরে। রেনেসাঁর প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে মানুষ পরিবর্তন চেয়েছিল। মানুষ সঙ্কট উপলব্ধি করেছিল। এজন্য ধর্মযাজকদের প্রাচীন ধ্যানধারণা, জড়ত্ব, স্থবিরতা, অন্ধত্ব, সবকিছুর মধ্যে পরকালীন শাস্তির ভীতিপ্রচার, নিজেদের ঐশ্বরিকতা ইত্যাদি

ধ্যান-ধারণা থেকে বাইরে বের হবার চেষ্টা করেছে শ্বাসরুদ্ধ মানুষ। তাদের চিন্তাকে ঐ জড় ধর্মচিন্তার কারাগার থেকে বের করে এনেছে বহু জীবনের বিনিময়ে, রক্তের বিনিময়ে, বহু প্রজন্মের সম্মিলিত প্রয়াসে। সেখান থেকে বের হয়ে মানুষ দেখেছে যে, না আসলেই তো আমার চিন্তা করার অনেক বিষয় আছে। সে একটা মুক্ত আকাশ পেয়েছে। এই যে চিন্তার মুক্তি তা মানুষকে নতুন একটি সভ্যতার সম্ভাবনার ঊষালগ্নে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। এরই নাম তারা দিয়েছে রেনেঁসা (renaissance), নবজাগরণ। সেখানে জ্ঞান-বিজ্ঞানের, শিল্প-সাহিত্যের একটা স্ফূরণ ঘটে গেছে। ধর্মযাজকদের কথা ছিল তাদের কথা মানলে পরকালে স্বর্গপ্রাপ্তি হবে, না মানলে নরক। কথায় কথায় তারা ফতোয়া দিয়ে মানুষকে পুড়িয়ে মারত, নৃশংস উপায়ে হত্যা করত। যারা এই রেনেঁসার অগ্রনায়ক তাদের লক্ষ্য ছিল এই পৃথিবীটাকে তারা স্বর্গে অর্থাৎ শান্তিময় আবাসে রূপান্তরিত করবেন। একদিকে বিকশিত হলো শিল্প-সাহিত্য, প্রযুক্তি আরেকদিকে জীবন চালানোর জন্য একটার পর একটা সৃষ্টি হলো উদারনৈতিক গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, আন্তর্জাতিকতাবাদ, সাম্যবাদ, পুঁজিবাদ ইত্যাদি। এগুলো তারা রচনা করলেন ঐ চিন্তাশক্তি দিয়ে, মস্তিষ্ককে স্বাধীনভাবে ব্যবহার করার মাধ্যমে। যারা করেছে তারা নিজেদের সমাজের সঙ্কটটাকে উপলব্ধি করেছিলেন বলেই পরিবর্তনের জন্য মরিয়া হয়ে উঠেছিলেন। কিন্তু সেই সভ্যতা বস্তুগত উন্নতির পাশাপাশি মানবজাতিকে এমন একটি নির্মম বাস্তবতা উপহার দিয়েছে যা অতীতের সব ভয়াবহতাকে ছাড়িয়ে গেছে। দুই দুইটি বিশ্বযুদ্ধের মাধ্যমে রেনেসাঁর যে নেটফল মানুষ লাভ করেছে তাতে তাদের সকল প্রাপ্তি অর্থহীনতায় পর্যবসিত হয়েছে। বিশ্বমানবতা সেই দানবিক শক্তির সামনে আত্মসমর্পণ করে নিয়েছে। এটা সুস্পষ্ট হয়ে গেছে যে, সেই মহান রেনেসাঁ কার্যত একটি আত্মাহীন একপেশে আখেরাত-বর্জিত, পাপ-পুণ্য, ন্যায়-অন্যায়ের জ্ঞানশূন্য, ভারসাম্যহীন সভ্যতার জন্ম দিয়েছে যা আসলে কোনো সভ্যতাই নয়, বরং ভোগবাদী একটি যান্ত্রিক প্রগতিমাত্র (Utilitarian Technological advancement)।

এখন যারা সমাজের সচেতন মানুষ, যারা শিল্প-সাহিত্য, সংস্কৃতি, পত্র-পত্রিকা নিয়ে আছেন সবার আগে তাদেরকে বর্তমানের সঙ্কটের গুরুত্ব আত্মা দিয়ে অনুধাবন করতে হবে। চিন্তা করতে হবে যে আজকের আন্তর্জাতিক সঙ্কট, জাতীয় সঙ্কট কতখানি গভীর। আজ চোখের সামনে মানুষ হত্যা হচ্ছে, অন্য মানুষ কোনো প্রতিবাদ করে না, চোখের সামনে নগর ধ্বংস হচ্ছে, মানুষ নির্বিকার টিভি দেখছে। প্রতিকারের জন্য কোনো চেষ্টা নেই। চোখের সামনে লুটপাট হচ্ছে, চাঁদাবাজি হচ্ছে কোনো প্রতিবাদ করে না, চোখের সামনে সব অন্যায় হচ্ছে মানুষ দেখছে না। ভাবছে দেখে কী লাভ? এর অর্থ মানুষ অন্যায়কারীর কাছে, শক্তিমানের কাছে আত্মসমর্পণ করেছে, সে হাল ছেড়ে দিয়েছে। ভাবছে আমি কোনোমতে জীবনটা কাটাই। এখন এই দুর্বলকে কে জাগাবে? কে তাদের ডেকে তুলবে? কে নতুন একটি রেনেসাঁ, নবজাগরণের সূচনা করবে? কে নতুন সভ্যতার আলো ছড়াবে? শিক্ষিত মানুষ কর্পোরেট বাণিজ্যের গোলাম হয়ে গেছে। অর্থের কাছে আত্মা বিক্রি করে দিয়েছে। এখন আমাদের প্রগতি নয়, অধঃগতি, এখন উন্নতি নয় পতন, আমাদের এখন কেবল পরাজয়। আসন্ন বিশ্বযুদ্ধ তো একটা পরিণতি, আমাদের সবার অথর্বতা, স্থবিরতা, নিষ্ক্রিয়তার যোগফলমাত্র। সেই ধ্বংস, পরিণতি সামনে। এখনও বুঝতে হবে, জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সঙ্কটটা কী? চোখে তো প্রতিদিনের বিপর্যয় দেখতেই পাচ্ছেন, আর কত দেখবেন? আর দেখার কি আছে? এর পরেও দৃষ্টি ক্লান্ত হচ্ছে না? এখনই সময় আরেকটি নবজাগরণের যে জাগরণ হবে যাবতীয় অন্যায়ের বিরুদ্ধে।

ইউরোপের সেই বিপ্লব, সেই রেনেসাঁ মানবজাতিকে যা দেওয়ার তা দিয়েছে। বহু প্রযুক্তি দিয়েছে, কিন্তু মানুষকে শান্তি দিতে পারে নি। এটা পারবেও না। এখন তা শক্তির শাসনে পর্যবসিত হয়েছে। তাদের সদিচ্ছার কোনো কমতি ছিল না কিন্তু তাদের আবিষ্কৃত ফর্মুলা বা পদ্ধতিগুলো তাদের কাঙ্ক্ষিত স্বর্গ দিতে পারে নি। পৃথিবীটা আজ স্বর্গের বদলে নরককুণ্ডে পরিণত হয়েছে, তারা একটি আত্মাহীন, মানবতাহীন, ভারসাম্যহীন সভ্যতার জন্ম দিয়েছে। এ সত্যটি যত দ্রুত মানুষ হৃদয়াঙ্গম করবে তত দ্রুতই তারা পরবর্তী রেনেসাঁর অভিমুখে যাত্রার সূচনা করতে পারবে। আসলেই আমাদেরকে একটি নতুন রেনেঁসা করতে হবে, এই রেনেসাঁ হবে যাবতীয় অন্যায়ের বিরুদ্ধে, যাবতীয় অসত্যের বিরুদ্ধে, যাবতীয় স্থবিরতার বিরুদ্ধে। অতীতে ধর্মের বিকৃত রূপগুলো মানুষকে স্থবির করেছিল, এখন করেছে পাশ্চাত্যের বস্তুবাদী ভোগবাদী মতবাদগুলো। ফল একটাই- কান্না, অন্যায়ের কাছে আত্মসমর্পণ ও অসহায়ত্ব।

এই যে সাম্প্রদায়িকতা, জঙ্গিবাদ, অপরাজনীতি, যুদ্ধ, সংঘাত মানুষকে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে ফেলেছে, তারা এসব থেকে কিছুতেই বের হতে পারছে না। মানুষ তো ধাঁই ধাঁই করে বাড়ছে। যার অবশ্যম্ভাবী পরিণতিতে মানুষ প্রয়োজন পূরণ করতে গিয়ে আইন, নীতি-নৈতিকতা ধর্ম সবকিছুই ধ্বংস করে ফেলছে। এখনও কি শিক্ষিত সমাজ এই সংকটটি উপলব্ধি করবেন না? যারা ঘরের কাছেই নিপীড়িত জনতার চিৎকার শুনে না, শুনলেও নিজেদের ধারণকৃত ব্যবস্থার জালে অসহায় বন্দীর মতো চেয়ে থাকতে বাধ্য, কিছু করতে অক্ষম, যারা পাশের বাড়ির মানুষের চিৎকার শুনে না, এরা বধির, এরা মৃত। মানবসভ্যতাকে এই স্থবিরতা থেকে, মৃত অবস্থা থেকে উদ্ধারের জন্য একদিন রেনেঁসা হয়েছিল। সেই মানুষগুলি পরিবর্তনের জন্য উন্মুখ ছিল, কিন্তু

এখনকার মানুষ সক্রিয়ভাবে পরিবর্তনও চায় না। তাদের চেতনা নেই, বোধ শক্তি নাই। খাচ্ছে দাচ্ছে টিভি দেখছে যেন সব কিছু স্বাভাবিক আছে।

প্রগতি অতীতকে অস্বীকার করে না, অতীতে ফিরেও যায় না। সে অতীতকে মূল্যায়ন করে সামনের দিকে এগিয়ে যায়। সময়ের পরিবর্তনে মানুষের মননশীলতার সঙ্গে মানানসই, কালের প্রয়োজন পূরণ করার মতো ব্যবস্থা নিয়েই যুগে যুগে নবী রসুলদের আগমন হয়েছে। না হলে একজন নবী দিয়েই কাজ চলত। এক লক্ষ চব্বিশ হাজার নবী-রসুল এসেছেন মানুষকে প্রগতির শিক্ষা দেয়ার জন্য, মানুষকে পিছনে ফেরানোর জন্য নয়। কিন্তু এখন আমরা পেছন দিকে হাঁটছি। আমরা অহঙ্কার করি আদিম সমাজে নাকি জোর যার মুল্লুক তার ছিল। এখনকার কথিত আধুনিক প্রগতিশীল সমাজে মুল্লুক কার? আমরা তো অতীতেই ফিরে গেছি। আপনারা উঁচু টাওয়ারের অহঙ্কার করেছেন। উঁচু উঁচু টাওয়ার অতীতের অনেক সভ্যতাই বানিয়েছিল। পিরামিড বানিয়েছিল, ঝুলন্ত বাগান বানিয়েছিল। সেই সব উঁচু টাওয়ার অভিশাপ হলো কেন, পর্যটকদের দর্শনীয় পরিত্যক্ত স্থান হলো কেন? কারণ উন্নতি প্রগতি যখন অহঙ্কারের বস্তু হয়ে দাঁড়ায় তখন তা অভিশাপে পরিণত হয়। এই আধুনিক সভ্যতার প্রযুক্তিগত উৎকর্ষ অহঙ্কারের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। সাবধান! অতীত থেকে শিখুন।

ইউরোপের রেনেসাঁর আগের রেনেসাঁটি ঘটিয়েছিলেন আল্লাহর শেষ রসুল মোহাম্মদ (সা.)। তিনি আরব জাতিকে জাহেলিয়াতের বন্দিদশা, কূপমণ্ডূকতা থেকে এমন এক হ্যাঁচকা টানে বের করে আনলেন যে সেই অশিক্ষিত মূর্খ আরবরা জ্ঞানের প্রতিটি শাখায় সকল জাতির শিক্ষকের আসনে অধিষ্ঠিত হলো। তাদের চিন্তাশক্তি এতটাই গতিশীল হলো যে, তারা রসায়ন, ভূগোল, জ্যোতির্বিদ্যা, প্রযুক্তি, জীববিজ্ঞান, ভূতত্ত্ব, চিকিৎসা বিজ্ঞান, সঙ্গীত, শিল্পকলা, স্থাপত্যবিদ্যা ইত্যাদি বিষয়ে বিশাল ভূমিকা রাখলেন, হাজার হাজার মহামূল্যবান বই রচনা করলেন। বহু নতুন ভূখণ্ড তারা আবিষ্কার করলেন। সামরিক শক্তিতে তারা ছিলেন অপরাজেয়, রোমান পারস্যের মতো হাজার বছরের পুরনো শক্তিও তাদের সামনে শুকনো পাতার মতো উড়ে গিয়েছিল। উরাল পর্বত, কারাকোরাম, কিরঘিজ পর্বতের শিখরে তাদের পতাকা উড়ল। সেই আরবজাতি যারা কিছুদিন আগেও ছিল চিন্তাহীন, অথর্ব, চুরি-ডাকাতি আর কামড়া-কামড়িতে ব্যস্ত, ছিল অন্যায়কারী, অন্যায়ের সাথে আপসকারী ভীরু কাপুরুষ, তাদেরকে আল্লাহর রসুল (স.) দুঃসাহসী যোদ্ধা ও অর্ধ দুনিয়ার শাসক জাতিতে পরিণত করলেন, তারাই বিশ্বের বুকে সবচেয়ে আলোকিত, মহিমান্বিত, সমৃদ্ধ জাতিরূপে আবির্ভূত হলো। ইতোপূর্বে তারা ধর্ম বলতে বুঝত কাঠ পাথরের মূর্তি পূজা আর মন্ত্রপাঠ অর্থাৎ সংকীর্ণ গণ্ডিতে, স্থবির জড়বস্তুর মধ্যে মানুষের অপার চিন্তাশক্তিকে আড়ষ্ট, আবদ্ধ করে রাখা হয়েছিল। মানবজীবন প্রচণ্ড গতিময়, ধর্মও যদি তদ্রূপ গতিময় না হয় তাহলে তা পরিত্যাক্ত হবেই, মানুষ তা বেশিদিন বহন করতে পারবে না, এটা প্রাকৃতিক। রসুলাল্লাহ (সা.) তাদেরকে কী ধর্ম শেখালেন? না, স্থবির উপাসনা নয় বরং অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করা, নির্যাতিত নিপীড়িত মানুষকে অত্যাচারী শাসকের জুলুম থেকে রক্ষা করা, ন্যায়ের স্থাপনা করা, এটাই তোমাদের ধর্ম, এটাই তোমাদের এবাদত। শেখালেন দৃষ্টিকে প্রসারিত করতে। তাঁর দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে সেই আরবরা নিজেদের সুপ্তসত্তাকে জাগ্রত করলেন, অনুভব করলেন তাদের মধ্যে অপার সম্ভাবনা লুকায়িত আছে। তারা নিজেদেরকে নতুনরূপে আবিষ্কার করলেন, বিশ্বের ইতিহাসকে পাল্টে দিলেন। আরব জাতির এ নবজাগরণ সম্বন্ধে, স্থবিরতার পরিবর্তে আলোড়ন সৃষ্টির নেপথ্য কারণ বলতে গিয়ে ইতিহাসবেত্তা Lothrop লিখেছেন- Forgetting the chronic rivalries and blood feuds which had consumed their energies is internecine strife, and welded into a glowing unity by the fire of their new found faith, the Arabs poured forth from their deserts to conquer the earth for Allah the One true God (The New World of Islam- Lothrop). অর্থাৎ "যে পুরাতন প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও পুরুষানুক্রমিক রক্তাক্ত বিবাদের দরুন ও আত্মকলহে তাদের শক্তি নিঃশেষ হচ্ছিল তা ভুলে যেয়ে এবং নতুন বিশ্বাসের আগুনে উজ্জ্বল ঐক্যে দৃঢ় সংবদ্ধ হয়ে আরবরা তাদের মরুভূমি থেকে বানের ঢলের মত নির্গত হলো- এক এবং সত্য আল্লাহর জন্য পৃথিবী জয় করতে।" কথা হলো, রসুলাল্লাহর সৃষ্ট এই রেনেসাঁ কিন্তু ইউরোপীয় রেনেসাঁর মতো আত্মাহীন, ভারসাম্যহীন, কেবল বস্তুতান্ত্রিক ছিল না। সেটা ছিল শরিয়াহ ও মারেফাত তথা দেহ-আত্মা, দুনিয়া আখেরাতের ধারণার সমন্বয়ে একটি ভারসাম্যপূর্ণ (Balanced) সভ্যতা। যে সভ্যতা মানুষে মানুষে ভেদাভেদ দূর করে সম্প্রীতি সৃষ্টি করেছিল, সমাজকে অর্থনৈতিকভাবে সমৃদ্ধ করেছিল, কিন্তু পুঁজিবাদের শোষণ সেখানে ছিল না, অধিকাংশ মানুষ নৈতিক মূল্যবোধে, আত্মিক মানবিক গুণাবলীতে আলোকিত মানুষে পরিণত হয়েছিল। কালেভদ্রে কেউ অপরাধ করলে নিজে গিয়ে আদালতে নিজের প্রায়শ্চিত্যের জন্য শাস্তি কামনা করত, তাকে ধরে আনার জন্য পুলিশ গোয়েন্দাবাহিনী কিছুই প্রয়োজন পড়ত না। অর্থাৎ মানুষের ভেতরে বাহিরে আমূল পরিবর্তন এসেছিল। এটাই হলো প্রকৃত বিপ্লব, প্রকৃত রেনেসাঁ। সেই যে রেনেসাঁ সৃষ্টি করে দিলেন রসুলাল্লাহ (স.) তার ধাক্কা চললো কয়েক শতাব্দী। আবার যখন এই উম্মাহতে ভারসাম্য নষ্ট হলো তখন তাদের শাসকেরা অর্থাৎ খলিফারা রাজা-বাদশাহ সেজে ভোগবিলাসে মত্ত হয়ে গেল। একদিকে ভারসাম্যহীন সুফিবাদ জাতির সংগ্রামী বহির্মুখী

চরিত্রকে অন্তর্মুখী করে দিল, গতিশীল জাতিকে স্থবির করে দিল; অপরদিকে আলেম মুজতাহিদ, মোফাসসেররা দীনের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করে লক্ষ লক্ষ মাসলা মাসায়েল উদ্ভাবন করে জাতিকে বহু ফেরকা, মাজহাবে বিভক্ত করে ফেলল। সহজ সরল দীনকে এমনভাবে মাকড়সার জালের ন্যায় জটিল ও দুর্বোধ্য করে ফেলল যে তা সাধারণের বোধগম্যতার বাইরে চলে গেল। দীনের ভারসাম্য নষ্ট হলো। এভাবে জাতিকে পঙ্গুত্ব পেয়ে বসল, তারা অন্তর্মুখী জড় হয়ে গেল। তারপর থেকে তাদের উপর আবার গজব শুরু হলো যা এখনও চলছে।

এখন আমরা হেযবুত তওহীদ চেষ্টা করছি আবারও একটি রেনেসাঁ, নবজাগরণের সূচনা করতে, মানুষের চিন্তার জগতে বিপ্লব ঘটাতে। বুদ্ধি, চিন্তা, আত্মা, দৃষ্টি, বিবেক খুলে দিতে। মানুষকে উপলব্ধি করতে হবে সঙ্কটের গভীরতা। তাকে জাগতে হবে, এই গোলকধাঁধা থেকে বের হওয়ার পথ সন্ধান করতে হবে।

লেখক- এমাম, হেযবুত তওহীদ।

মো'মেনের বৈশিষ্ট্য

মসীহ উর রহমান

কোর'আন-হাদীসে মো'মেনদের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে অনেক তথ্য আমরা পাই, সেগুলো নিয়ে ধর্মবেত্তাগণ অনেক আলোচনা করেন। কিন্তু প্রকৃত উম্মতে মোহাম্মদীর ইতিহাস পর্যবেক্ষণ করলে আমরা মো'মেনদের আরো কিছু গুরুত্বপূর্ণ চারিত্রিক ও জাতীয় বৈশিষ্ট্য আমরা জানতে পারি, যেগুলো তেমন আলোচনায় আসে না। এখানে তেমনই কিছু বৈশিষ্ট্য আমরা তুলে ধরছি।

১. একজন মো'মেন একমাত্র আল্লাহর হুকুম ছাড়া কারো হুকুম মানবে না।

২. জীবন-সম্পদকে মানবতার কল্যাণে উৎসর্গ করবে।

৩. হুজুগে মাতবে না ও গুজবে কান দেবে না।

৪. মো'মেনরা পৃথিবীতে ন্যায়-প্রতিষ্ঠা করবে।

৫. মো'মেনরা নিজেদের মধ্যে দয়া-মায়ায় (রুহামা) পূর্ণ হবে।

৬. তারা ইস্পাতের মতো দৃঢ় ঐক্যবদ্ধ থাকবে।

৭. তারা পিঁপড়ার মতো সুশৃঙ্খল হবে।

৮. তারা মালায়েকের মতো তাদের নেতার আনুগত্য করবে।

৯. তারা লক্ষ্যে থাকবে একাগ্র (হানিফ)।

১০. সত্য প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে তারা হবে দৃঢ়, অটল, সংশপ্তক (সাবের)।

১১. তারা হবে মোহাজের অর্থাৎ হেজরতকারী। সকল অন্যায়, কুফর, শেরক, তাগুত থেকে তারা সদা-সর্বদা নিজেদেরকে পৃথক রাখবে। অন্যায় অসত্যকে বয়কট করবে।

১২. তারা হবে সর্বদা সজাগ, সতর্ক।

১৩. তারা হবে যুক্তিবোধসম্পন্ন, উদার চিন্তার অধিকারী। কোনো কূপমণ্ডূকতা, অন্ধবিশ্বাস, যুক্তিহীনতা তাদের চরিত্রে থাকবে না।

১৪. তাদের জাতি হবে প্রচণ্ড গতিশীল, উদ্যমী। চিন্তা ও কর্মের স্থবিরতা তাদেরকে স্পর্শ করবে না।

১৫. তারা হবে প্রচণ্ড সাহসী, দুর্নিবার, দুর্বিনীত। আল্লাহ ছাড়া কোনো শক্তির কাছেই তারা মাথা নত করবে না।

১৬. তারা হবে রুকুকারী, সেজদাকারী অর্থাৎ আল্লাহর হুকুমের সামনে, তার শ্রেষ্ঠত্বের সামনে মো'মেন হবে দ্বিধাহীন, প্রশ্নহীন, শর্তহীন আনুগত্যকারী (সাজেদিন), বিনীত, নম্র (কানেতিন), আত্মসমর্পিত (মুসলিম)।

১৭. সমাজে বিরাজিত যাবতীয় অন্যায়ের বিরুদ্ধে সর্বাবস্থায় সোচ্চার সংগ্রামী (মোজাহেদ)।

১৮. তার সমস্ত আমল হবে দুনিয়া ও আখেরাতের ভারসাম্যে পূর্ণ (ওয়াসাতা), উভয় জীবনকে সামনে রেখে।

১৯. দীনের সমস্ত কাজ সে করবে অকপটচিত্তে (মোখলেস), কোনো লোক দেখানো কাজ সে করবে না, বৈষয়িক স্বার্থেও করবে না।

২০. দীন নিয়ে বাড়াবাড়ি করবে না। অন্যের ব্যক্তিগত বিশ্বাসের উপর কটাক্ষ, বিদ্রূপ করে তার ধর্মকে হেয় প্রতিপন্ন করবে না।

বাংলার ইতিহাসের সাথে এমামুয্যামানের যোগসূত্র

মাননীয় এমামুয্যামান ছিলেন ঐতিহ্যবাহী পন্নী জমিদার পরিবারের সন্তান। তাঁর পরিবারের স্বর্ণোজ্জ্বল ইতিহাস ইতিহাসের পাঠকমাত্রই জানেন। সুলতানী যুগে এবং মোগল আমলে এ পরিবারের পূর্বপুরুষগণ ছিলেন অত্র এলাকার শাসক। এমন কি তারা দীর্ঘকাল বৃহত্তর বাংলার (তদানীন্তন গৌড়) স্বাধীন সুলতান ছিলেন। বাংলাদেশের ইতিহাস, শিক্ষা, সংস্কৃতির সঙ্গে এই পরিবারের কীর্তি এক সূত্রে গাঁথা। বাংলার সর্বশেষ স্বাধীন সুলতান ছিলেন এমামুয্যামানেরই পূর্বপুরুষ দাউদ খান পন্নী (কররানি)। মাননীয় এমামুয্যামান জনাব মোহাম্মদ বায়াজীদ খান পন্নীর পূর্বপুরুষ দাউদ খান পন্নীর পরাজয় এবং হত্যাকাণ্ডের মধ্য দিয়েই মূলত বাংলার শাসন ক্ষমতা থেকে 'স্বাধীন' শাসকের অবসান ঘটে। এরপর শুধু পন্নী বংশই নয়, কোন শাসকই আর স্বাধীনভাবে বাংলা শাসন করতে সক্ষম হন নি। পন্নী রাজবংশের পরাজয়ের পর বারো ভূঁইয়াখ্যাত পন্নীদের অনুগত দৃঢ়চেতা কমাণ্ডার ও জমিদারগণ দিল্লীর কেন্দ্রীয় সরকারকে অস্বীকার করে আঞ্চলিকভাবে স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। পরে অবশ্য তারাও মুঘলদের বশ্যতা স্বীকার করতে বাধ্য হন। মুঘলদের অধীনস্থ নবাব সিরাজউদ্দৌলার পতনের পর ধীরে ধীরে শাসন ক্ষমতা ইংরেজদের হাতে চলে যায়।

ব্যক্তিজীবন:

আমাদের এই উপমহাদেশসহ সমগ্র পৃথিবী যখন খ্রিষ্টান ঔপনিবেশিক শাসন ও শোষণের যাতাকলে নিষ্পেষিত, বিশেষ করে মুসলিম বিশ্ব যখন ইউরোপিয়ানদের হাতে চরমভাবে নির্যাতিত, লাঞ্ছিত ঠিক সেই মুহূর্তে আল্লাহ এই জাতির উপর সদয় হলেন, তিনি আখেরী নবীর উম্মতের মধ্য থেকে একজনকে সত্যের জ্ঞান দান করলেন, তিনি হচ্ছেন এ যামানার এমাম জনাব মোহাম্মদ বায়াজীদ খান পন্নী। মাননীয় এমামুয্যামান ১৫ শাবান ১৩৪৩ হিজরি মোতাবেক ১৯২৫ সনের ১১ মার্চ শেষ রাতে জন্মগ্রহণ করেন। এমামুয্যামানের রয়েছে এক কর্মময় বর্ণাঢ্য জীবন-ইতিহাস। তাঁর শৈশব কাটে করটিয়ার নিজ গ্রামে। ১৯৪২ সনে মেট্রিকুলেশন পাশ করেন। কোলকাতার ইসলামিয়া কলেজে তাঁর শিক্ষালাভের সময় পুরো ভারত উপমহাদেশ ছিল ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা সংগ্রামে উত্তাল আর কোলকাতা ছিল এই বিপ্লবের অন্যতম কেন্দ্রবিন্দু। আন্দোলনের এই চরম মুহূর্তে তরুণ এমামুয্যামান আল্লামা এনায়েত উল্লাহ খান আল মাশরেকীর প্রতিষ্ঠিত 'তেহরীক এ খাকসার' নামক আন্দোলনে যোগ দিয়ে ব্রিটিশ বিরোধী সংগ্রামে জড়িয়ে পড়েন। সেই সুবাদে তিনি এই সংগ্রামের কিংবদন্তীতুল্য নেতৃবৃন্দের সাহচর্য লাভ করেন যাদের মধ্যে মহাত্মা গান্ধী, কায়েদে আযম মোহম্মদ আলী জিন্নাহ্, অরবিন্দু ঘোস, হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দি, সাইয়্যেদ আবুল আলা মওদুদী অন্যতম। ছোট বেলা থেকেই তাঁর ছিল শিকারের শখ। শিকারের লোমহর্ষক সব অভিজ্ঞতা নিয়ে তাঁর লেখা 'বাঘ-বন-বন্দুক' (১৯৬৪) নামক বইটি খ্যাতনামা সাহিত্যিক ও সমালোচকদের দ্বারা প্রশংসিত হয়। ক্রীড়াঙ্গনেও তিনি ছিলেন একজন অগ্রপথিক। ১৯৫৬ সনে অস্ট্রেলিয়ার মেলবোর্নে অনুষ্ঠিত বিশ্ব অলিম্পিক চ্যাম্পিয়নশিপে অংশগ্রহণের জন্য পাকিস্তান দলের অন্যতম রায়ফেল শুটার হিসাবে নির্বাচিত হন।

১৯৬৩ সনে এমামুয্যামান তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান আইন পরিষদের সদস্য অর্থাৎ এম.পি. নির্বাচিত হন। তিনি ছিলেন একজন প্রখ্যাত চিকিৎসক। বাংলাদেশের সাবেক রাষ্ট্রপ্রধান আবু সাঈদ চৌধুরী, সাবেক প্রধানমন্ত্রী আতাউর রহমান খান, জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামসহ অনেক বরেণ্য ব্যক্তি তাঁর রোগীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তিনি ছিলেন বাংলাদেশ নজরুল একাডেমির একজন প্রতিষ্ঠাতা সদস্য। তিনি ভারতীয় ক্লাসিক্যাল সঙ্গীতের একজন বিশেষজ্ঞ ছিলেন। ১৯৬৩ সনে তিনি করটিয়ায় হায়দার আলী রেডক্রস ম্যাটার্নিটি এ্যান্ড চাইল্ড ওয়েলফেয়ার হসপিটাল প্রতিষ্ঠা করেন যার দ্বারা এখনও উক্ত এলাকার বহু মানুষ উপকৃত হচ্ছে। পরবর্তীতে তিনি সা'দাত ওয়েলফেয়ার ফাউন্ডেশন নামে প্রতিবন্ধী শিশুদের উন্নয়নের জন্য একটি দাতব্য সংস্থা প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি ছিলেন সত্যের মূর্ত প্রতীক। তিনি তাঁর সমগ্র জীবন সত্য সন্ধান এবং সত্যের জন্য লড়াই করে গেছেন। তাঁর ৮৬ বছরের জীবনে একবারের জন্যও আইনভঙ্গের কোনো রেকর্ড নেই, নৈতিক স্খলনের কোন নজির নেই। আধ্যাত্মিক ও মানবিক চরিত্রে বলীয়ান এ মহামানব সারাজীবনে একটিও মিথ্যা শব্দ উচ্চারণ করেন নাই। ১৬ জানুয়ারি ২০১২ ঈসায়ী তারিখে এই মহামানব প্রত্যক্ষ দুনিয়া থেকে পর্দাগ্রহণ করেন।

মুসলিম জাতি সম্পর্কে এমামুয্যামানের ভাবনা:

ভেদাভেদ আর হানাহানিতে লিপ্ত অন্য জাতিগুলি দ্বারা শোষিত ও লাঞ্ছিত মুসলিম জাতি সম্পর্কে এমামুয্যামান ভাবতেন ছোট বয়স থেকেই। ছোটবেলায় যখন তিনি মুসলিম জাতির পূর্ব ইতিহাসগুলি পাঠ করেন তখন থেকেই তাঁর মনে কিছু প্রশ্ন নাড়া দিতে শুরু করে। প্রশ্নগুলো তাঁকে প্রচণ্ড দ্বিধাদ্বন্দ্বে ফেলে দেয়, তিনি এগুলির জবাব জানার জন্য ব্যাকুল হয়ে ওঠেন। তাঁর শৈশবকালে প্রায় সমগ্র

মুসলিম বিশ্ব ইউরোপীয় ছোট ছোট জাতিগুলো দ্বারা সামরিকভাবে পরাজিত হয়ে তাদের অধীনতা মেনে নিয়ে জীবনযাপন করছিল। মুসলিম জাতির অতীতের সাথে বর্তমান অবস্থার এই বিরাট পার্থক্য দেখে তিনি রীতিমত সংশয়ে পড়ে যান যে এরাই কি সেই জাতি যারা সামরিক শক্তিতে, ধনবলে ছিল পৃথিবীর সবচেয়ে শক্তিমান, জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রতিটি অঙ্গনে যারা ছিল সকলের অগ্রণী? কিসের পরশে এই জাতি ১৪০০ বছর পূর্বে একটি মহান উম্মাহয় পরিণত হয়েছিল, আর কিসের অভাবে আজকে তাদের এই চরম দুর্দশা, তারা সকল জাতির দ্বারা পরাজিত, শোষিত, দাসত্বের শৃঙ্খলে আবদ্ধ, দুনিয়ার সবচেয়ে হত-দরিদ্র ও অশিক্ষা-কুশিক্ষায় জর্জরিত, সব জাতির দ্বারা লাঞ্ছিত এবং অপমানিত?

সত্যের সন্ধান লাভঃ

মহান আল্লাহর অশেষ রহমতে তিনি ধীরে ধীরে অনুধাবন করলেন কী সেই শুভঙ্করের ফাঁকি। ষাটের দশকে এসে তাঁর কাছে এই বিষয়টি দিনের আলোর মতো পরিষ্কার হয়ে ধরা দিল। তিনি বুঝতে পারলেন কোন পরশপাথরের ছোঁয়ায় অজ্ঞতার অন্ধকারে নিমজ্জিত আরবরা যারা পুরুষাণুক্রমে নিজেদের মধ্যে হানাহানিতে মগ্ন ছিল, যারা ছিল বিশ্বের সম্ভবত সবচেয়ে অবহেলিত জাতি, তারাই মাত্র কয়েক বছরের মধ্যে এমন একটি ঐক্যবদ্ধ, সুশৃঙ্খল, দুর্ধর্ষ যোদ্ধা জাতিতে রূপান্তরিত হলো যে তারা তখনকার দুনিয়ার দু'টি মহাশক্তিকে (Super power) সামরিক সংঘর্ষে পরাজিত করে ফেলল, তাও আলাদাভাবে নয় - একই সঙ্গে দু'টিকে, এবং অর্ধ পৃথিবীতে একটি নতুন সভ্যতা অর্থাৎ দীন (যাকে বর্তমানে বিকৃত আকিদায় ধর্ম বলা হয়) প্রতিষ্ঠিত করেছিল। সেই পরশপাথর হচ্ছে প্রকৃত ইসলাম যা আল্লাহর শ্রেষ্ঠ রসুল সমগ্র মানবজাতির জন্য নিয়ে এসেছিলেন। এমামুয্যামান আরও বুঝতে সক্ষম হলেন আল্লাহর রসুলের ওফাতের এক শতাব্দী পর থেকে এই দীন বিকৃত হতে হতে ১৩'শ বছর পর এই বিকৃতি এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে, ঐ সত্যিকার ইসলামের সাথে বর্তমানে ইসলাম হিসাবে যে ধর্মটি সর্বত্র পালিত হচ্ছে তার কোনোই মিল নেই, ঐ জাতিটির সাথেও এই জাতির কোনো মিল নেই। শুধু তাই নয়, বর্তমানে প্রচলিত ইসলাম সীমাহীন বিকৃতির ফলে এখন রসুলাল্লাহর আনীত ইসলামের সম্পূর্ণ বিপরীত একটি বিষয়ে পরিণত হয়েছে। যা কিছু মিল আছে তার সবই বাহ্যিক, ধর্মীয় কিছু আচার অনুষ্ঠানের মিল। ভেতরে, আত্মায়, চরিত্রে এই দু'টি ইসলামের মধ্যে কোনো মিলই নেই, এমনকি দীনের ভিত্তি অর্থাৎ তওহীদ বা কলেমার অর্থ পর্যন্ত পাল্টে গেছে, কলেমা থেকে আল্লাহর সার্বভৌমত্বই হারিয়ে গেছে, দীনের আকিদা অর্থাৎ এই দীনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে ধারণাও বদলে গেছে।

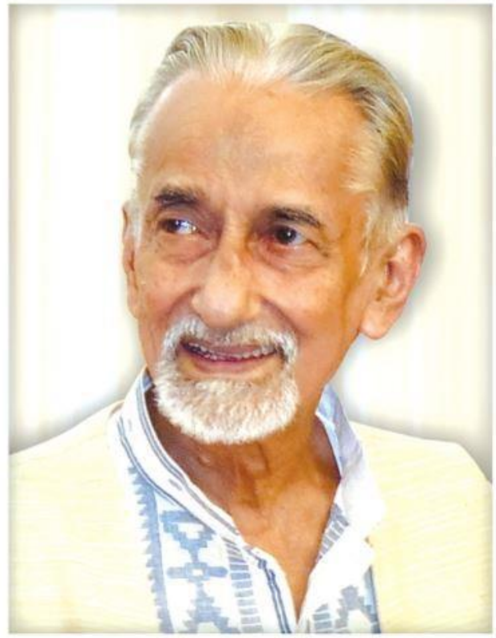

এমামুয্যামান মোহাম্মদ বায়াজীদ খান পন্নী

হেযবুত তওহীদ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে মানবজাতিকে তওহীদের বালাগ ও ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বানঃ

এই জাতির পতনের কারণ যখন তাঁর কাছে স্পষ্ট হয়ে গেল, তখন তিনি কয়েকটি বই লিখে এই মহাসত্য মানুষের সামনে তুলে ধরার প্রয়াস পান। ১৯৯৫ সনে এমামুয্যামান হেযবুত তওহীদ আন্দোলনের সূচনা করেন এবং মানুষকে প্রকৃত ইসলামে ফিরে আসার জন্য আহ্বান জানাতে থাকেন। তিনি বলেন, আল্লাহ ছাড়া জগতের সকল বিধানদাতা, হুকুমদাতা, সার্বভৌম অস্তিত্বকে অস্বীকার করাই হচ্ছে তওহীদ, এটাই এই দীনের ভিত্তি। সংক্ষেপে এর মর্মার্থ হচ্ছে আমি জীবনের প্রতিটি বিষয়ে যেখানেই আল্লাহ ও তাঁর রসুলের কোনো বক্তব্য আছে সেটা ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, আইন-কানুন, দণ্ডবিধি যে বিভাগেই হোক না কেন, সেই ব্যাপারে আমি আর কারও কোন বক্তব্য, নির্দেশ মানি না। তওহীদের এই শিক্ষা, দাবি কোথাও নেই। পুরো মানবজাতি নিজেই এখন নিজের জীবনব্যবস্থা তৈরি করে সেই মোতাবেক জীবন চালাচ্ছে। ফলে তারা শিরক, কুফর, বেদাতের মধ্যে নিমজ্জিত। মাননীয় এমামুয্যামান মানবজাতিকে এই শেরক, কুফর ও বেদাত থেকে মুক্ত হয়ে পুনরায় সেই কলেমায় ফিরে আসার ডাক দিয়েছেন। তিনি আরও বলেছেন, আমাদের দেশসহ সমস্ত পৃথিবীব্যাপী যে অন্যায়, অবিচার, অশান্তি চলছে তার নেপথ্য কারণ হলো আল্লাহ প্রদত্ত সেই সঠিক আদর্শকে পরিহার করেছি। এখন সেই আদর্শের ভিত্তিতে ঐক্য হওয়া ছাড়া আর কোনো পথ নেই।